বৈষ্ণোদেবী
অমরনাথ দর্শন

বিপুল সাহা

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স।। ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলকাতা - ৭০০ ০৪৩

Vaishnodevi Amarnath Darshan
by *Bipul Saha*
Published by
Samir Kumar Nath
Nath Publishing
26B, Panditia Place,
Kolkata-700 029
Rs 40.00

সর্বসত্ত্ব শ্রীমতী ভারতী সাহা

প্রকাশক ঃ
সমীর কুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬বি, পণ্ডিতিয়া প্লে-স,
কোলকাতা-৭০০ ০২৯

প্রথম প্রকাশ ঃ আশ্বিন ১৪০৯, অক্টোবর ২০০২
প্রথম সংস্করণ ঃ এপ্রিল ২০১০

গ্রন্থনা ঃ সব্যসাচী চৌধুরী

মুদ্রক ঃ অনিশা, ১৩২এ/ওয়ান/ডবলু, রাজা রাজেন্দ্রলাল
মিত্র রোড, কলকাতা-৮৫, দূরভাষ -৩৫৩ ১৩৫২

প্রচ্ছদ ঃ সন্দীপ সাঁতরা

মূল্য - ৪০ টাকা

স্নেহের
ডাঃ দীপিকা হালদার
ও
ডাঃ চিন্ময় হালদারকে

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ ঃ
পার্ল হার্বার
কার্গিল কাশ্মীর
ঈশ্বের দেবতা ও সৃষ্টি
কুমায়ুণ ভ্রমণ
ধর্ম ভাবনা বিজ্ঞান ভাবনা

বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী

কেউ কি ব্যাকুল হয়ে বাঁশরী বাজায়? হয়তো বাজায়, তা নাহলে আর কেউ তা শোনে কি করে? যার কানে পৌঁছয় তার সুর, সে বেরিয়ে পড়ে পথের টানে দেশ-দেশান্তরে। কখনো প্রাণের দেবতার খোঁজে, কখনো মানুষের সমাজের বৃহত্তর আঙ্গিনায় – সাহিত্যে, শিল্পকর্মে বা মানুষের সেবায়। আউল-বাউল অথবা সংসারবিবাগী হয়ে। কেউ তীর্থ করতে যায়, কেউ প্রকৃতি দর্শনে।

বাউল হইনি, বিবাগী হতে পারিনি। অসংসারী হয়ে জীবন ব্যয়িত হল ঢের। যা হল তা ভাল না মন্দ জানি না। কারণ আজ যা ভাল দেখি কাল তা মন্দ হয়ে যায়। বিশেষ করে ৯ই মে, ২০০২ সালের পরে চারদিকের মানুষগুলোর আমূল পটপরিবর্তন হতবাক করে দিয়েছে। এই বিচিত্র স্বার্থসঙ্কুল সংসারে বাস করতে করতে ক্লিষ্ট হলে আরো বেশি করে ছুটে যাই প্রকৃতির আঙ্গিনায় বিচরণ করতে – পাহাড়পর্বতে, সমুদ্রবেলায়, মরু প্রান্তরে বা অরণ্যে। কখনো ইতিহাসের ভগ্নস্তূপে। মনের মধ্যে কোথাও বসে কেউ যেন বাঁশি বাজায়। তার করুণ সুরের টানে পথে নেমেছিল প্রবোধ সান্যাল, শঙ্কু মহারাজ, উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়রা। এরকম নাম জানা না-জানা আরো অনেকে।

সকলেই হয়তো লেখে না। তবে যারা পথে বেরিয়ে পড়তে ভালোবাসে, তারা পথের গল্প করতে চর্চা করতেও ভালোবাসে। সেই চর্চায় যোগ দিতে দু-চার কথা লিখে রাখা। এই পর্যায়ে বৈষ্ণোদেবী এবং অমরনাথ দর্শনের অভিজ্ঞতার কথা বলা হল। কী জানি, যদি কারো ভালো লেগে যায় সেই আশায়।

দ্বিতীয় দফায় প্রকাশ করার জন্য পরিমার্জনা করা হল একটুআধটু।

বিনীত
বিপুল সাহা

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড
কোলকাতা-১০
এপ্রিল, ২০১০

বৈষে(াদেবী দর্শন

১।
গোড়ার কথা

১৯শে মার্চ ১৯৯৫। রোববার সকালে বসে গল্প হচ্ছিল দুজনের মধ্যে। খবরের কাগজের ভ্রমণ সংক্রান্ত পাতা চোখের সামনে মেলে ধরে পড়া হচ্ছে। কোন ট্রাভেল এজেন্সি কোথায় বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছে, কবে যাচ্ছে, কত টাকায় নিয়ে যাচ্ছে, সে সব কাগজ পড়ে শোনানো হচ্ছে গিন্নিকে। শেষে বিনীত প্রশ্ন করছিলাম — যাবে নাকি অমুক জায়গায়, তমুক জায়গায়?

এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে নির্‌দ্বেগ উত্তর দিয়ে চলেছে গিন্নি — চল, শুধু কবে যাচ্ছ বলে দাও।

মুখে তার না নেই একটিবারের জন্যেও। কৃত্রিম রোষে বলি — ওহ্, সাধে কি মেজকাকিমা তোমাকে বলত হেঁটো। পা বাড়িয়েই আছ।

— সেই সঙ্গে কেমন জুটেছ তুমি। ফি রোববার কাগজ পড়ে এখানে যাব ওখানে যাব বলার বাতিক কার শুনি? সমানে চোখা উত্তর মিলত জবাবে। কথার হুল ফোটাতে কোন সমঝোতা নেই গিন্নির।

বেড়ানোর এই খেলা খেলতে একবার মজা করে বললাম — এই দেখ, বৈষে(াদেবী যাচ্ছে কতলোক। যাবে নাকি? ওখানে তো আমাদের যাওয়া হয়নি এখনো। একবার গেলে হয়।

— চল। কোন ব্যাপারই না।

এমন উদাত্ত সম্মতি জানানোর অর্থ প্রচ্ছন্ন অসম্মতি ছাড়া আর কী ভাবা যেতে পারে? দূর ছাই! ভাইপো সন্দীপ্তর পরী'খ'া পরদিন থেকে। পড়াশোনা করার থেকে না করার দিকেই ওর মন। ধরেবেঁধে পরী'খ'ায় পাশ করাতে হবে। দায়টা ওর বাবা নিখিলের আর মামামের মানে জেঠিমা ভারতীর। দায় ওদের হলেও পড়িয়ে উদ্ধার করতে হবে আমাকে। সেসব ফেলে এখুনি বেড়াতে যাওয়ার কোন প্রশ্নই নেই।

সেদিন বিকেলবেলা শ্যামবাজারে ভারতীর ছোড়দা-ছোট বৌদির পার্টি দিয়েছে। ছোড়দা মানে ভারতীর মাসতুতো দাদা দিলীপ আর ছোটবৌদি শ্যামলী। আমেরিকা থেকে উড়ে এসেছে ওরা। বিবাহের রজত জয়ন্তী বর্ষে আত্মীয়স্বজনকে আপ্যায়ন করবে বলে।

ওখানে কনিষ্ঠ ভগ্নীপতি অশোককে পেয়ে ভারতী একটু খুঁচিয়ে দেওয়ার লোভ সামলাতে পারল না। বলল — অশোক, তোমার দাদা বৈষে(াদেবী যাবে বলছে।

অশোকেরও ভীষণ ঘোরার বাতিক। বৈষে(াদেবী শুনে অমনি লাফিয়ে উঠল — সত্যি যাবেন মেজদি? আমারও খুব যাওয়ার ইচ্ছে। বলেন তো ট্রেনের টিকিটের ব্যবস্থা করি?

— আরে না না দাঁড়াও। সন্দীপ্তর বাৎসরিক পরী'খ'া আছে না? গেলে হত আর কী, সেকথা বলছি! আমতা আমতা করে জবাব দিই।

— তাস্তুর এক্‌জাম্ কবে শেষ হচ্ছে?

— উনতিরিশে মার্চ।

তিনদিন পরে ছোড়দা-বৌদিকে বিদায় জানাতে যেতে হল বেলেঘাটায়। মালপত্র লোটবহর নিয়ে ওরা এয়ারপোর্ট চলে গেল। অবশ্য যখন পৌঁছল, তখন বিমান আকাশে ডানা মেলেছে। অগত্যা আবার বাড়ি ফেরা এবং পরদিন যাত্রার ব্যবস্থাদি করা। সেসব নিয়ে কথা হচ্ছে।

সন্ধ্যার পরে অশোক এসে বলল — এই নিন রেলের টিকিট।

জম্মু যাওয়ার জন্যে তিনজনের নামে কাটা হয়েছে। টিকিট হাতে নিয়ে বলি — করেছ কি! যাব কি যাব না ঠিক করা হল না, আর টিকিট হাজির। টাকাপয়সার ব্যবস্থাও দেখা হয়নি এখনো।

— ছাড়ুন তো ওসব, টাকাপয়সা ঠিক ম্যানেজ হয়ে যাবে। ফেরার টিকিট কবেকার কাটব বলুন।

ছুটিছাটা নিয়ে আমরা ভাবিনা ঠিকই। কিন্তু টাকাপয়সা নিয়ে ভাবি না তা নয়। অবশ্যই ভাবতে হয়। এখন তো হাতে টিকিট — না গেলেই নয়। অশোক দেখছি জোর করে ঘরের বার করেই ছাড়বে।

— কদিনের প্রোগ্রাম করা যায়? দিন সাতেক হলে হয় না?

— তা হয়, তবে বলছি কি, বৈষে(াদেবী থেকে ডালহৌসি-চাম্বা ঘুরে এলে হয় না?

— তা মন্দ বলোনি। সম্ভব হলে সেই সঙ্গে ধরমশালা-জ্বালামুখী। দুবার হিমাচলে গিয়েও যাওয়া হয়নি ওদিকটায়।

বেড়ানোর পরিকল্পনা করতে আমার ভালোই লাগে। এসব নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা পরিকল্পনা করা সবটাই বেড়ানোরই অঙ্গ বলে মনে হয়। ওর মধ্যে বেড়ানোর আনন্দ আছে অনেকটা।

কদিন পরে ফোনে খবর এল শ্রীরামপুর থেকে। শ্রীরামপুর মানে আমাদের ও-তরফের হেডকোয়ার্টার — ডি-ফ্যাক্টো-কন্ট্রোলরুম। ভাও তথা ভারতীর কাছে বড়দি পার্বতীর সুধাকণ্ঠ ধেয়ে এলো — এই তোরা বৈষে(াদেবী যাচ্ছিস? কে কে যাচ্ছিস?

– এই তো আমরা দুজন আর অশোক। ভারতী জানায়।

– আমাকে নিয়ে যাবি না?

– নিয়ে যাব না কেন, গেলেই নিয়ে যাব। সত্যি তুমি যাবে?

– যাব বলেই তো ফোন করছি।

– শরীর গতিক ঠিক আছে তো? অসুবিধে হবে না?

– দ্যাখ ভাও, মরব তো একদিন। তা সে হয় এখানে অথবা ওখানে। নিয়ে চল তো দেখি তারপর যা হওয়ার হবে।

– তবে তুমি বাবা আগে তোমার ছেলেমেয়ের কাছ থেকে স্যাংশন করিয়ে নাও।

পার্বতীদি নানা রোগেভোগে অসুস্থ। হার্টের রোগ প্রেসারের রোগ কি নেই তার! ধনী ঘরনীদের যেমনটি থাকার কথা সবই যেন তার আছে। সকলেই তাকে নিয়ে বেড়াতে যেতে ভয় পায়। ভারতী, ডাকনাম ভাও, বেপরোয়া। তার উপর প্রাথমিক ডাক্তারি বিদ্যে ভালোই জানা আছে অশোকের। সেটা বড়ো ভরসা। মামণি মানে দীপিকাও সেকথা বলল – ভাও, তোমার সঙ্গে মাকে ছাড়তে ভয় নেই। তার উপর ছোটমেসো আছে। বাবা মারা যাওয়ার পরে মা একমাত্র তোমাদের সঙ্গেই মন খুলে কথা বলতে পারে। তোমাদের সঙ্গে নিশ্চিন্তে পাঠানো যায়। তা আর কোথায় যাবে? নাকি শুধু বৈষে(াদেবী?

– ডালহৌসি চাম্বা ধরমশালা যাওয়ার ইচ্ছে আছে।

জয়ন্ত-মামণিরা মজা করে পিছনে লাগতে বসল – ডালহৌসি মানে আমাদের ধর্মতলা-ডালহৌসি? সে তো এমনি গেলেই হয়। আর চাম্বা খাম্বা সেসব কোথায় কোন রাজ্যে? কোত্থেকে এসব জায়গার নাম জোগাড় করেন কে জানে!

শেষ পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে মাতৃদেবীর বেড়াতে যাওয়ার সম্মতি জুটল। অশোক আরেকখানা টিকিটের ব্যবস্থা করে ফেলল বড়দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

২।
কোলকাতা থেকে কাটরা

একে তো পয়লা এপ্রিল তার উপর শনিবার পড়েছে যাত্রার দিন। শিয়ালদহ থেকে ৩১৫১ জম্মু-তাওয়াই এক্সপ্রেস ছাড়বে সকাল ১১-৪৫ মিনিটে। এরকম দিনে জম্মু তাওয়াই এক্সপ্রেস বোধ হয় দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ওঁচা বগি জুড়ে জুড়ে রেলযাত্রার ব্যবস্থা করে। এটা আগে থেকে জানা ছিল না। তো সেই রকম একখানা কামরার স্লিপার কোচে চারজনে আসীন হয়েছি। বাথরুমের জানালা খোলা, পাল্লাখানা কেউ দয়া করে নিচে নামিয়ে রেখেছে। ভাগ্যিস ফেলে দেয়নি। সেটাকে জানালার গায়ে একহাতে সেঁটে ধরে

তবু যা হোক টয়লেট ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে। এমন নিদারুণ পরিস্থিতিতে ট্রেনযাত্রা আর কখনো করতে হয়নি আমাদের।

এবার ঠিক করেছি যা কিছু দেখব শুনব সবই নির্দ্বিধায় দারুণ-ভালো দারুণ-সুন্দর বলব। মন্দ হলেও মন্দ বলব না, মন্দ ভাবব না। ভালো মন নিয়ে সুন্দর ও ভালো ভাবতে পারলে সবকিছুই ভালো লাগবে। ভালোমন্দ গুণাগুণ বস্তুগত ততটা নয়, যতটা মানুষের রচনা। ব্যক্তি তার প্রাথমিক ধারণার উপর ভিত্তি করে গঠন করে তার নিজস্ব প্রবণতা। সেই চশমায় ধরা পড়ে ভালোমন্দ। অতএব এমন ট্রেনজার্নিও বেশ ভালো বলে মেনে নিতে হল।

ট্রেন মুগলসরাই- বারাণসী-লখ্নৌ-লাক্সার-আম্বালা-জলন্ধর-পাঠানকোট হয়ে জম্মু যাচ্ছে। মোট দূরত্ব ১৯৬৭ কিলোমিটার। ৪৬ ঘন্টা দৌড়ে সোমবার বেলা দশটা নাগাদ পৌঁছনোর কথা। শেষ পর্যন্ত পৌঁছল মাত্র দুঘন্টা লেট করে। ওটা কোন ব্যাপারই নয়। দুপুরের মধ্যে তো পৌঁছল জম্মু।

অনেক দিন পরে আবার জম্মু আসা। প্রায় উনিশ বছর আগে এসেছিলাম এদিকে। কুলু-মানালী হয়ে ভূস্বর্গ কাশ্মীর যাওয়ার পথে। পুরোনো দিনের সেই চিত্রটা দেখি সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে।

এখন জম্মু স্টেশন একেবারে অন্যরকম, অনেক সাজানো গোছানো। তাওয়াই এবং চন্দ্রভাগা নদী জম্মুকে দুদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। শহরে আছে বাহু রাজাদের দুর্গ। তাওয়াই নদীর বাঁ দিকে। উত্তরে বিধ্বস্ত রামনগর দুর্গ। শহরের মধ্যমণি অবশ্য রঘুনাথ মন্দির। সেসব কিছুই দেখা হবে না আমাদের।

স্টেশন থেকে অটো ধরে জম্মু বাসস্ট্যাণ্ড যেতে হল। সেখান থেকে বাসে করে কাটরা যেতে হবে। বাসস্ট্যাণ্ড মানেই বিশ্রী জটলা। সন্ত্রস্ত হয়ে অপে'খ'া করছি কাটরার বাসের জন্যে। জম্মু-কাশ্মীর আজকাল ভয়ানক জায়গা। যখন তখন সন্ত্রাসবাদীরা গোলাগুলি চালিয়ে দিচ্ছে, বোমা ফাটিয়ে খুনখারাবী করছে। আশেপাশের মানুষজনের মধ্যে কে জঙ্গী, কে পাকিস্তানী চর, আর কে ছাপোসা সাধারণ মানুষ, বুঝে ওঠা দায়। সবাইকেই জঙ্গীদলভুক্ত বা চর বলে সন্দেহ হয়।

একটু পরে কাটরাগামী সরকারী বাস পাওয়া গেল। জম্মু থেকে কাটরা ৪৮ কিলোমিটার রাস্তা। শহর ছাড়িয়ে বাইরে যেতেই পাহাড়ী উঁচুনিচু পথ আর সবুজ প্রান্তর পড়ল। হু হু করে বসে দৌড়চ্ছে শ্রীনগরের দিকে। 'জাতীয় সড়ক-১এ' ধরে কিছুদূর এগিয়ে তারপর বাঁদিকে বাঁক নেবে। অধিকাংশ যাত্রী কাটরা যাচ্ছে। খুব একটা ভীড় ছিল না বাসে।

পথে বার চারেক বাস থামিয়ে তল্লাশি হল যাত্রীদের। না শুধু যাত্রী নয়। বাসটিকেও আগাপাস্তালা ভালো করে সার্চ করা হল। বলা তো যায় না, জঙ্গীরা বাসের মধ্যে শক্তিশালী বোমা লুকিয়ে রেখেছে কিনা! নিরাপত্তা র'খীরা কোন ঝুঁকি নিতে পারে না। সন্দেহ

হলেই নানা প্রশ্ন। কোথা থেকে আসছেন? কোথায় যাবেন? মালপত্র কি আছে? বৈষে(াদেবীর খুব কাছে পাকিস্থান সীমান্ত। এই সব করে করে ৪৮ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করতে প্রায় আড়াই ঘন্টা সময় লাগল।

বৈষে(াদেবীর প্রবেশদ্বার কাটরা। সমুদ্রতল থেকে ২৫০০ ফুট উচ্চতায় এর অবস্থান। হোটেল ধর্মশালার অভাব নেই। বাসে আসার পথেই অনেক হোটেল চোখে পড়েছে। আমাদের আশ্রয় জুটল জম্মু-কাশ্মীর ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের ট্যুরিস্ট বাংলোয়। বাসস্ট্যান্ডের কাছেই। মুস্কিল হল যে একখানা মাত্র ঘর পাওয়া গেল। দৈনিক ভাড়া ৩৩০ মুদ্রা। পার্বতীদিদি আশ্বস্ত করল — একখানা ঘর হলেও অসুবিধা হবে না। একদিনের ব্যাপার। আসলে জায়গাটি ভালো তো, এখানেই রাত্রিবাস করা যাক।

ইতিমধ্যে আমরা দেখে এসেছি একেবারে বাসস্ট্যান্ডের সামনেই যাত্রীদের জন্যে রয়েছে ট্যুরিস্ট রিসেপশন সেন্টার। মুহুর্মুহু মাইকে ঘোষণা হচ্ছে বৈষে(াদেবী দর্শনের যাত্রীদের যাত্রা-স্লিপ সংগ্রহ করতে হবে।

বাংলোর ঘরটি মন্দ নয়। এখান থেকে দেখা যাচ্ছে সামনের ত্রিকূট পাহাড়। পাকদন্ডী পথে তীর্থযাত্রীরা চলেছে শেরাওয়ালীর দর্শনে। বড়োই জাগ্রতা দেবী এতদঞ্চলে। মালপত্র নামিয়ে ঘরে ঢুকে প্রথম কাজ হল নিশ্চিন্ত হয়ে এক পাত্র চা পান। নিচেই রেস্তোরা।

অশোক চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করল — আজ রাতেই যাবেন তো দর্শনে?

— আজ রাতে?

— রাতেই ভালো। দুপুরের গরম নেই। বেশির ভাগ লোকজন রাতে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় যাত্রা করে। ওই দেখুন না সারা রাস্তা ঝলমল করছে আলোয়। লোকজন দিনরাত যাচ্ছে আর আসছে। কোন ভয় নেই।

— দিদি কি পারবে ট্রেন জার্নি করে আজই যেতে? দাঁড়াও ভারতীকে জিজ্ঞেস করি।

ভারতীকে বললাম — অশোক বলছে আজ রাতে বেরিয়ে পড়তে। দিদি কি পারবে?

— ওরে বাব্বা একেবারেই নয়। রাতটা বিশ্রাম না নিয়ে যাওয়া অসম্ভব। তবু দিদিকে একবার জিজ্ঞেস করে নিই।

পার্বতীদিকে জিজ্ঞেস করতে বলল — কাল সকালে চল ভাও। আজ রেস্ট নে।

অশোককে সেকথাই বলা হল — আজ নয় আগামীকাল যাব। এতটা ট্রেন জার্নি করে দিদির কষ্ট হয়েছে। বুঝতেই পারছ। অসুস্থ মানুষ। বেশি পরিশ্রম নেওয়া অনুচিত। আজকে বিশ্রাম নিয়ে কাল সকালে দর্শনে যাওয়া ভালো। আমাদের হাতে তো সময় আছে।

অশোক একটু অখুশি হল। আসলে বেড়াতে এসে চুপচাপ বসে থাকতে ওর ভালো লাগে না। তা না লাগারই কথা। ও পরিশ্রমী ছেলে। পথকষ্ট কাবু করতে পারে না সহজে। ঘরের মধ্যে বসে থাকা কী করে ওর ভালো লাগবে? বললাম — তুমি যদি

একান্ত বেরিয়ে পড়তে চাও তাহলে বেরিয়ে পড়তে পার। আমরা না হয় আগামীকাল সকালে যাব।

— তা কি করে হয়? আলাদা আলদা দর্শনে যাব? না তা হয় না। আসলে ঘরে বসে থাকতে ভালো লাগছে না। তাহলে যাই একটু ঘুরেফিরে জায়গাটা দেখে আসি।

অশোক একা বেরিয়ে পড়ল। আগামীকালের জন্যে যাত্রাস্লিপ ওই সঙ্গে নিয়ে আসবে। ঘোড়া-ডাণ্ডি করে আমরা পাহাড়ে যাব। কোথা থেকে তার ব্যবস্থা হবে, কিরকম ভাড়া পড়বে, সেসব খোঁজখবরও নিয়ে আসবে।

ট্রেনের ধরাচুড়ো ছেড়ে ফ্রেস হয়ে বসে গল্প করছি। কিছু(ণ পরে অশোক ফিরে এল চক্কর দিয়ে। যেখান থেকে পাহাড়ে চড়া শু(, ও ততদূর পর্যন্ত ঘুরে এসেছে। আমারও যাওয়ার ইচ্ছে ছিল ওর সঙ্গে। কিন্তু দুজন মহিলাকে হোটেলে ফেলে চলে যাওয়া যায় না। যাই হোক ঘোড়া-ডাণ্ডি কোথায় পাওয়া যাবে সেসব অশোক দেখেশুনে এসেছে। বাসস্ট্যাণ্ডের রিসেপশন থেকে যাত্রাস্লিপও বানিয়ে নিয়ে এসেছে।

সামান্য বিশ্রাম নিয়ে দিদি চাঙা হয়ে উঠেছে। একটু পরে আমরা চারজনে বাইরে বেরোলাম ঘুরতে। অশোক এবার আমাদের গাইড। কাটরা জায়গাটা ঘুরেফিরে দেখতে চাই, যতটা দেখা যায় পায়ে পায়ে হেঁটে। আসলে পার্বতীদিদির পখে' যতটা পদব্রজে চলা সম্ভব আর কী!

এখানে কী কিছু দ্রষ্টব্য আছে? অশোক জানাল — আছে। কাটরা থেকে জম্মুর পথে চার কিলোমিটার দূরে দেবী মাঈর স্থান আছে। নোমেইন গ্রামে।

আগেকার দিনে জম্মু থেকে পায়ে হেঁটে ভক্তরা যখন বৈষে(াদেবী আসত, তখন এই নোমেইন গ্রামে পৌঁছে যাত্রাবিরতি করত। এখানকার মন্দিরে মাতা বৈষে(াদেবীর মূর্তি আছে। মন্দিরের বাইরে রয়েছে মহাদেবের ত্রিশূল। এখন যাত্রীরা সোজাসুজি কাটরা চলে যায়। কেউ আর নোমেইন যায় না। ফলে এদিকে আজকাল জনসমাগম হয় না বললেই চলে।

কাটরায় রঘুনাথ মন্দির আছে আধ কিলোমিটার দূরে। রাম, সীতা ও লছমণের মন্দির। রামসীতার আসন যেখানে, পরমভক্ত হনুমান সেখানে না থেকে পারে? সুতরাং হনুমানেরও এক মূর্তি থাকতে হবে। সে মূর্তি আবার যেনতেন কোন মূর্তি নয়। বিশালাকার — ওজন চল্লিশ কুইন্টালেরও বেশী। এছাড়া আশুতোষের মন্দির আছে। আর আছে স্বামী নিত্যানন্দের সমাধি।

দু'কিলোমিটার দূরে রয়েছে ভূমিকা মন্দির। পানথাল রোডের উপর। বৈষে(াদেবীর আবিষ্কর্তা কিংবা স্রষ্টা বাবা শ্রীধর এখানে সাতশ বছর আগে দেবীমাতার দর্শন পেয়েছিলেন। দর্শনলাভের পরে ভাণ্ডারার আয়োজন করেছিলেন। মর্ত্যধামে দেবীপ্রতিষ্ঠার ভূমিকা এখান থেকেই শুরু বলে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের নাম হয়ে গেল ভূমিকা মন্দির।

জানা গেল এখানে ইস্কন প্রতিষ্ঠিত কালকা মাতার মন্দির আছে। সেই সঙ্গে শ্রীলা প্রভুপাদ আশ্রম। যাত্রীদের কাছ থেকে ইস্কনের ভক্তরা দান সংগ্রহ করছিল। যে যেমন দান করল তাকে সেই মতো নানা অঙ্কে মুদ্রিত টাকার রসিদ দিচ্ছিল। অনেকটা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের টাকার মতো। শুধু নোটে যেখানে গান্ধীর ছবি থাকে সেখানে একদিকে রয়েছে প্রভুপাদের ছবি, অন্যদিকে আশ্রম-মন্দিরের ছবি। যাত্রাপথে পড়বে চিন্তামণি ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠিত ধর্মশালা। সেই সঙ্গে একটি শিব মন্দির। কাটরায় শালিমার গার্ডেন নামে সুন্দর এক বাগিচা আছে। অবশ্যই তা কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ মুঘল গার্ডেন নয়। শালিমার উদ্যান থেকে মনোরম ত্রিকূট পাহাড় ভারি সুন্দর দেখা যায়।

এলোমেলো একপ্রস্থ ঘুরেফিরে ঘরে ফিরে এসেছি। এদিকে সন্ধ্যা নামে অনেক বেলায়। কোলকাতার প্রায় এক ঘন্টা পরে। দোকানপাট লোকজনে কাটরা জমজমাট জায়গা। ট্যুরিস্ট বাংলোর সামনে একদল কুলি ঘোরাঘুরি করছিল। এরা যাত্রীদের মালপত্র বহন করে নিয়ে যায় পাহাড়ি পথে। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে কাশ্মীরি হবে। ময়লা ছিন্ন জামাকাপড়। অভুক্ত শীর্ণ চেহারা। মনে হয় এদের বিশ্বাস করে অ-কাশ্মীরিরা কোন কাজকর্ম দিতে চায় না। বেরোজগারীর চিহ্ন সর্বাঙ্গে। পর্যটক-নির্ভর সাধারণ কাশ্মীর ধুকছে মুষ্টিমেয় জঙ্গীপনার দৌলতে। এদের দেখে খারাপ লাগছিল।

অদূরে ত্রিকূট পর্বত শোভা পাচ্ছে। সারারাত ধরে তীর্থযাত্রীরা যাতায়াত করছে পর্বত বেয়ে ঘুরে ঘুরে চলা চড়াই পথ দিয়ে। পথের উপরকার আলোকসজ্জা বাংলো থেকে দেখতে পাচ্ছি। এমন আলো দিয়ে সাজানো যাত্রাপথ সহসা চোখে পড়বে না যেখানে চব্বিশ ঘন্টাই চলাফেরা করা যায় নিশ্চিন্তে।

কাটরা থেকে ১৪ কিলোমিটার দূরে বৈষ্ণোদেবীর গুহামন্দির। ১৬১৪ মিটার বা ৫৩০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। তার মানে কাটরা থেকে গুহার উচ্চতা হচ্ছে ২৮০০ ফুট। দৈর্ঘ্যে গুহাটি প্রায় ৩০ মিটার। শুনেছি গুহার মধ্যে মাথা নিচু করে, প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হয় দেবীদর্শনে। নিচে বয়ে চলেছে চরণগঙ্গা। বৈষ্ণবী দেবী দুর্গামাতার আরেক রূপ। অত্যন্ত জাগ্রত দেবী হিসেবে মান্য, বিশেষ করে উত্তর ভারতে। প্রতি বছর নবরাত্রির সময় দীর্ঘ আড়াই মাস ধরে তীর্থযাত্রীরা আসে এখানে। তখন লাখের অধিক যাত্রীর সমাগম হয়। দেবীদর্শনের জন্যে ষোলো সতেরো ঘন্টা লাইনে দাঁড়াতে হয় যাত্রীদের। এমনিতে বারো মাসই ভক্তদের আগমন অব্যাহত।

আমাদের রাতের ভোজনপর্ব হল বাংলোর পিছনের রেস্তোরায়। দারুণ মটরপনির রাজমা আর ডালফ্রাই করেছিল। সেই সঙ্গে গরমাগরম চাপাটি। ফুৎকারে উদরগহ্বরে চালান করা হচ্ছিল সেসব। একথা সত্যি যে উদরের শান্তিই হল জগতের শ্রেষ্ঠ শান্তি।

একজোড়া সিঙ্গল বেডে প্রমাণ সাইজের চারজনকে ম্যানেজ করে শুতে হবে। প্রথম কথা, লম্বালম্বি চারজনের জায়গা হবে না। শুতে হবে আড়ের দিকে। অশোক দীর্ঘদেহী।

চওড়ার দিকে শুলে ওর পা নির্ঘাৎ ঝুলে থাকবে। আমাদের তিনজনের দৈর্ঘ্য নিয়ে কোন সমস্যা নেই। নাটা হওয়ার মস্ত সুবিধে এই প্রথম বোঝা গেল। তা না হয় হল, কিন্তু দুটো সিঙ্গল বেডে চারজনকে কুলোনো বেশ কঠিন ব্যাপার।

শুরুতে তো কোনরকমে সেট হওয়া গেল। সমস্যা হল মাঝরাতে। একজন শয্যাত্যাগ করে যেই না টয়লেট গিয়েছে, অমনি তার পরিত্যক্ত জায়গাটুকু নিঃশব্দে ভরাট করে ফেলল পাশের জন। ভাবখানা একটু নড়াচড়ার জায়গা পাওয়া গিয়েছে যা হোক। টয়লেট থেকে ফিরে এসে সে বেচারা দেখে শয্যায় তার জায়গা নেই। চেঁচামেচি করে ঠেলেঠুলে একে ওকে সরিয়ে তবে তাকে শোওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়েছে। সেও এক মজা। পথে বেরিয়ে এসব ঘটনা খুব কষ্টকর কিছু নয়। বরঞ্চ বেশ উপভোগ্য।

৩।
ত্রিকূট যাত্রা

পরদিন সকালে ত্রিকূটযাত্রা আমাদের। দেবী দর্শনে।

পৌনে কিলোমিটার পথ হেঁটে পৌঁছই দর্শনী-দরজার কাছে — বৈষ্ণোদেবীর প্রবেশদ্বারে। প্রস্তর নির্মিত দরজা। এখান থেকে ত্রিকূটের পাহাড়ি পথের সমগ্র ছবিটা দৃশ্যমান। তাই এই নাম হয়তো। দেবীমাতাও ভূমিকা থেকে অদৃশ্য হওয়ার পরে এই স্থান থেকে যাত্রার সূচনা করেছিলেন।

দরজা থেকে সামনের দিকে রাস্তা নিচে নেমে গিয়েছে বাণগঙ্গার উপরকার সেতু পর্যন্ত। আগের দিন দর্শনের যাত্রাস্লিপ (পরচি) করে এনেছিল অশোক বাসস্ট্যান্ডের ট্যুরিস্ট রিসেপশন সেন্টার থেকে। জেনে রাখা ভালো — যারা আগে থেকে পরচি না করাবেন, তাদের বাণগঙ্গা থেকে আবার ফিরে যেতে হবে কেবলমাত্র এই পরচি করিয়ে আনতে। এখানে যাত্রাস্লিপ প্রথম চেক করা হয়।

বাণগঙ্গায় শীর্ণকায় স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হচ্ছে। পুল পার হয়ে আমাদের ওপারে যেতে হবে। পাহাড়ের কোলে। রয়েছে বাণগঙ্গা মন্দির — আসলে তা বৈষ্ণোদেবীরই মন্দির। নিচে তাঁকে প্রণাম করে তারপর উপরের গুহায় তাঁকে দর্শন করতে যেতে হয়। দোকানপাট আছে। এখান থেকে পাহাড়ে ওঠার চড়াই শুরু। কিন্তু নাম বাণগঙ্গা কেন?

যে সকল যাত্রী ঘোড়া বা ডাণ্ডি করে যাত্রা করতে চায়, তাদের বাণগঙ্গা থেকে সেসবের ব্যবস্থা করতে হবে। হাঁটাপথে চড়াই বেশি কিন্তু দূরত্ব কম। ঘোড়া যে পথ দিয়ে যাবে সে রাস্তায় চড়াই কম কিন্তু দূরত্ব বেশি। আমরা স্থির করেছি ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে উপরে যাব। নেমে আসব হেঁটে। অশোক হাঁটতে পারে। সঙ্গী পেলে ও হয়তো

আসাযাওয়া দুটোই পদযুগলে সারত। সঙ্গীর অভাবে ওকে স্বভাব নষ্ট করতে হল। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া নিতে হল।

একেবারে সওয়ারী ওজন করে এখানে ঘোড়া-ডাণ্ডি ভাড়ার পাকা ব্যবস্থা আছে। এবং তা সরকারী কমিটির পরিচালনায়। সুতরাং ভাড়া নিয়ে দরদস্তুর করার ঝামেলা নেই। আমার একপিঠের ঘোড়ার জন্যে ধার্য হল ৮৬ টাকা। পার্বতীদির জন্যে ডুলি নেওয়া হচ্ছে। আসা যাওয়া দুপিঠের জন্যই। তার জন্য মূল্য দিতে হবে ৬০০ টাকা।

হালকা শীতের আমেজ ছড়ানো সকাল। মিষ্টি রদ্দুর ঝলমল করছে চারিদিকে। তীর্থযাত্রীদের মুখে মুখে ফিরছে জয়গান — জয় মাতাদি, জয় মাতাদি।

আমরা উৎফুল্ল মনে পাকদণ্ডী পথে এগিয়ে চললাম হালকা চড়াই ভেঙে। একটু চলার পরে বুঝতে পারলাম হেঁটে গেলেও খুব সমস্যা হত না। তবে দিদির সঙ্গে তাল মেলানো মুস্কিল হত।

সতীর দশ মহাবিদ্যার কথা শুনেছি — তাঁরা হলেন কালিকা, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, সুন্দরী, বগলা, ধূমাবতী, মাতঙ্গী ইত্যাদি। তিনি কখনো পার্বতী, কখনো দুর্গা, কালী, বৈষ্ণোদেবী বা সরস্বতী। দ'খ'যজ্ঞে ছিন্নভিন্ন সতীদেহ ছড়িয়ে পড়েছিল এবং তা থেকে গড়ে উঠেছে সতীর একান্ন পীঠ। সেকথা আমরা সকলেই জানি। কোলকাতার কালিঘাট তার মধ্যে একটি পীঠ যেখানে সতীর কড়ে আঙুল পড়েছিল বলা হয়। তেমনি নলহাটিতে রয়েছে নলাটেশ্বরী পীঠ। উত্তর ভারতে নয়টি পীঠ প্রধান বলে গণ্য করা হয়। সেগুলি হল নৈনাদেবী, চিন্তাপূর্ণী, জ্বালাদেবী, ভদ্রকালি, মনসাদেবী, শকুন্তলাদেবী, কালকাদেবী, কাঙ্গুরেওয়ালী এবং বৈষ্ণোদেবী। দশমহাবিদ্যাই হোক বা সতীপীঠ, আসলে সকল দেবীই এক শক্তির নানা প্রকাশ। তার যে কোন রূপ নিয়ে আমাদের অর্চনা। মাতা বৈষ্ণোদেবী এসবের মধ্যে একজন। ইনি জন্ম এবং উর্বরার প্রতীক রূপে পূজিতা হন। তাঁকে কল্পনা করা হয়েছে সিংহবাহিনী অষ্টভুজা দেবী রূপে। হস্তধৃত রয়েছে শঙ্খ, চক্র, গদা, ত্রিশূল, ধনুক, তরবারী ও কমল। একহাতে বরাভয়। কোন কোন চিত্রে তাঁকে ব্যাঘ্রবাহিনী রূপে কল্পিত হয়েছে। বলা হচ্ছে শেরাওয়ালী।

একটা কথা জেনে একটু অবাক হলাম যে এমন জাগ্রত মাতা বৈষ্ণোদেবী, কিন্তু তাঁর পূজার্চনার প্রচলন বহু প্রাচীন কালের ব্যাপার নয়। মাত্র সাতশ' বছর আগেকার ঘটনা। সেসব নিয়ে এখানে প্রচলিত দেবীর একান্ত ভক্ত পণ্ডিত শ্রীধরের বিচিত্র কাহিনী। তিনিই এই পীঠের আবিষ্কর্তা। তাঁর দ্বারাই ধরাধামে বৈষ্ণোদেবীর পূজা প্রচলিত হয়েছে। বর্তমানে তাঁর বংশধরগণ এই পীঠস্থানের স্বত্তাধিকারী এবং পূজারী।

কাটরা থেকে দু কিলোমিটার দূরে হনসল নামে একটি গ্রাম আছে। প্রায় সাতশ বছর আগে সেখানে বাস করতেন এক প্রবীন ভক্ত। নাম শ্রীধর। তাঁর সন্তানাদি ছিল না। এ

জন্যে মনে খুব দুঃখ ছিল। নিঃসন্তান ভক্ত শ্রীধর যে কাজটি যত্নভরে নিয়মিত করতেন তা হল কন্যাপূজা। শুধু পূজা নয়, নিষ্ঠাভরে পূজ্যা কন্যাদের তিনি চরণ ধুয়ে দিতেন।

ভক্তের প্রতি দেবদেবীরা চিরকাল দুর্বল। মাতা বৈষ্ণোদেবীও সদয় হয়ে একদিন কুমারী কন্যা রূপে দর্শন দিলেন শ্রীধরের কাছে। কন্যাদের চরণ ধোয়াতে বসে অনেক কন্যার মধ্যে দিব্য কুমারীকে চিনে নিতে সমস্যা হল না। স্বর্গীয় সৌন্দর্যে বিভূষিত তাঁর অনিন্দিত রূপ দেখে অভিভূত হয়ে ভাবতে লাগলেন — কে এই ভিনদেশী কন্যা?

কন্যাপূজার শেষে প্রাপ্ত অর্ঘ নিয়ে সকল কন্যা বিদায় নিলেও সেই দিব্যকন্যাটি বসে রইলেন। বিস্মিত শ্রীধর জিজ্ঞাসা করলেন — মা, আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?

কন্যাটি বললেন — বাবা, আমার জন্য আপনার এক মহৎ কর্ম করতে হবে।

— মহৎ কর্ম? বলুন মা, কি করতে হবে।

— গ্রামের সকল ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করে এক ভাণ্ডারার আয়োজন করতে হবে। আমি গ্রামবাসীদের স্বহস্তে আহার্য পরিবেশন করব।

শ্রীধরের ভক্তি অসীম হলেও আর্থিক সামর্থ্য সীমিত। সকলকে নিমন্ত্রণ করে ভোজন করানোর মতো সংস্থান নেই। ভাণ্ডারার নিমন্ত্রণ না হয় করা গেল। কিন্তু আহার্য দ্রব্যাদির ব্যবস্থাদি কী করে সংগৃহীত হবে ভেবে কূলকিনারা পেলেন না। তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তবু দিব্যকন্যার কথামতো গ্রামবাসীদের নিমন্ত্রণ করতে বেরিয়ে পড়লেন।

নিমন্ত্রণ করতে গিয়ে শ্রীধরের সঙ্গে দেখা হল একদল সাধু সম্প্রদায়ের। তাঁদেরও যথাবিহিত নিমন্ত্রণ করা হল।

পরদিন গ্রামের ব্রাহ্মণদের সঙ্গে কৌতূহলী নিমন্ত্রিত সাধুসম্প্রদায় শ্রীধরের গৃহে আগমন করলেন। এই সাধু সম্প্রদায়ের প্রধানের নাম ছিল গোর'খনাথ এবং তাঁর প্রধান শিষ্যের নাম ভৈরবনাথ। তাঁরা মনে মনে ভাবছিলেন — কে এই কুমারী কন্যা যে একেবারে ভাণ্ডারা খুলে সমস্ত গ্রামবাসীকে ভোজন করতে সাহসী হয়।

নিমন্ত্রিতেরা কুটির প্রাঙ্গনে সমবেত হলে দিব্যকন্যা কোথা থেকে আবির্ভূত হলেন কে জানে! চিন্তাকুল শ্রীধরকে বললেন — চিন্তা করবেন না। আপনার অতিথিদের কুটিরের মধ্যে এনে বসান। খাদ্য প্রস্তুত রয়েছে।

সেই ছোট্ট কুটিরে একজন একজন করে প্রবেশ করল। কুটির 'খুদ্র হলেও আশ্চর্যের কথা যে সকলের উপবেশনের মতো পর্যাপ্ত জায়গাও হয়ে গেল। তারপর কুমারী দেবী স্বহস্তে তাঁদের সকলকে নানা প্রকার খাদ্য পরিবেশন করতে লাগলেন। যে যেমন ভোজন করতে ইচ্ছে করল, তাকে তেমন আহার্যদ্রব্য দেওয়া হল। এমন কী যে যতটা খাদ্যদ্রব্য বাসনা করেছিল, তার জন্য ততটা পরিমানে আহার্য বস্তু পরিবেশিত হল।

সেসব দেখে সাধু সম্প্রদায় আরো আশ্চর্য হয়ে গেল। কে এই কন্যা? এঁর আশ্চর্য 'খ'মতার রহস্যটা কী? কোথা থেকে এঁর আবির্ভাব হল? ব্যাপারটা যাচাই করে দেখতে

হবে। তখন ভৈরবনাথ দেবীকে যাচাই করার জন্য ছলনা করে বললেন — আমি কি আমার পছন্দমতো খাদ্যবস্তু পেতে পারি?

— নিশ্চয় পারেন। বলুন আপনি কি প্রকার খাদ্য ইচ্ছা করেন?

— আমি মদ্য সহযোগে মাংস আহার করতে ইচ্ছা করি।

দেবী জানালেন — ব্রাহ্মণ-বৈষ(বদের পূজাস্থানে কেবলমাত্র শাকাহারী ভোজ্যদ্রব্য পাওয়া যায়। মদ-মাংস নয়।

একথা শুনে ভৈরবনাথ ক্রুদ্ধ হলেন। অঙ্গীকার করেও প্রার্থনামতো আহার্য না দেওয়ায় তাঁকে অপমান হয়েছে এমনটাই মনে করলেন। এজন্য কন্যার শাস্তি প্রাপ্য হয়। ক্রুদ্ধ ভৈরবনাথ হাত বাড়িয়ে কন্যাকে ধরতে গেলেন। নিমিষের মধ্যে দেবীকন্যা মায়াবলে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

উপস্থিত গ্রামবাসীরা আশ্চর্য হয়ে গেল — কোথায় গেলেন দিব্যকন্যাটি ?

এদিকে যোগবলে ভৈরবনাথ জানতে পারলেন যে সেই কন্যা পবননন্দিনীর রূপ ধারণ করে ত্রিকূট পর্বতের দিকে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর সঙ্গে রয়েছে পবনপুত্র বীর হনুমান। ভৈরবনাথ তখুনি বেরিয়ে পড়লেন শ্রীধরের কুটির থেকে।

এদিকে হনসল গ্রাম থেকে ত্রিকূটের পথে যেতে যেতে হনুমানের পিপাসা পেল। দেবী তাঁর তৃষ(ার কথা জানতে পেরে তখনই বাণ মেরে গঙ্গাকে নিয়ে এলেন। সেই জলধারায় হনুমানের তৃষ(া মিটল। বাণ থেকে জাত বলে সেই জলপ্রবাহের নাম হল বাণগঙ্গা।

খেয়াল করে দেখেছি, ভারতবর্ষে যেখানেই প্রবাহিনী রয়েছে, সেখানেই প্রবাহের পবিত্রতা নির্ণয়ে দেখতে পাই এরকম গঙ্গার অবতারণা। এদেশে অজস্র গঙ্গা। বিশেষ করে উত্তর ভারতে। যেন জল মানেই গঙ্গা।

ত্রিকূটের পথে চলতে চলতে দেবীকন্যা একবার বিশ্রামের জন্যে দাঁড়ালেন। অমনি কঠিন শিলাপ্রস্তরে তাঁর চরণচিহ্(অঙ্কিত হয়ে গেল। আমরা সেই জায়গায় প্রস্তরখণ্ডে চরণপাদুকা খোদাই করে দেবীর চরণ বলে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসছি। কথায় বলে বিশ্বাসে মিলায় বস্তু। এও তাই।

আমরা তিনজনে ঘোড়ায় করে চলতে চলতে সেই চরণ-পাদুকায় এসে পৌঁছলাম। পার্বতীদিও এসে পৌঁছল একটু পরেই।

ভক্তরা অবিরাম জয়ধ্বনি দিতে দিতে পথ চলেছে — জোরসে বোলো জয় মাতাদি। প্রেমসে বোলো জয় মাতাদি। ফিরসে বোলো জয় মাতাদি। যো না বোলে ...

বাণগঙ্গা থেকে চরণ পাদুকা মাত্র দেড় কিলোমিটার দূরে। সমুদ্রতল থেকে এখানকার উচ্চতা ৩৩৮০ ফুট। অর্থাৎ আমরা ইতিমধ্যে মাত্র ৮৮০ ফুট উচ্চতা অতিক্রম করেছি।

ভূমিতল থেকে একটু উঁচুতে ছোট্ট মন্দির। গম্বুজের মতো শিখরদেশ। ভক্ত(রা কঠিন পাথরে দেবীর চরণচিহ্(মুদ্রিত দেখতে পাচ্ছেন।

পূজারী বলছেন — শ্রীধরের ভাণ্ডারা থেকে পালানোর সময় দেবী এখানেই প্রথম বিশ্রাম নিতে কিছু সময় দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর পিছনে তখন ভৈরবনাথ ধেয়ে আসছেন। এই তাঁর চরণচিহ্(।

চরণপাদুকায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছি। দিদিও ডুলি থেকে নেমে হাত পা খেলিয়ে নিল। অশোক বলল — এদিকে গুলশন কুমারের সুনাম খুব। জানেন তো ওনার অনেক দানধ্যান আছে এদিকে।

পার্বতীদি আবার ডুলিতে চাপল। আমরা ঘোড়ায় সওয়ার হলাম। সারা পথ জুড়ে রয়েছে অজস্র সরাইখানা। চা আর ঠাণ্ডা পানীয়র দোকান। এত চা-জলখাবারের দোকানপাট অন্যত্র দেখা যায় কিনা সন্দেহ। পথের উপর যত্রতত্র নানা দেবদেবীর মন্দির। দুলকি চালে হালকা মেজাজে চলেছি। চড়াই ভাঙার কষ্ট নেই।

চরণপাদুকা থেকে আরো সাড়ে তিন কিলোমিটার এগিয়ে আমরা পৌঁছলাম আধিকুঁয়ারী বা আধিকুমারী। ৪৮০০ ফুট উচ্চতায়।

আধিকুঁয়ারী ভারী সুন্দর জায়গা। বাঁহাতে প্রশস্ত মন্দির-চাতাল। শীতের মিঠে রোদে ভাসছে গোটা প্রাঙ্গন। বেশ কিছু ভক্ত জড়ো হয়েছে আধিকুঁয়ারীর মন্দিরের সামনে। বড়ো মন্দির নয়। দেবী জগদম্বার আরাধনার সুব্যবস্থা আছে। ভক্তবৃন্দ ভিড় করেছে মন্দিরের সামনে।

এমন সুন্দর জায়গায় একটু না বসলেই নয়। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। নিচে কাটরা ছবির মতো দেখাচ্ছে। চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে খেতখামার। বহুদূর পর্যন্ত সবুজের মেলা। ঝলমল করছে নীলাকাশ। অঢেল শান্তি ছড়ানো। দূর থেকে দেখলে সব কিছুই কেমন সুন্দর দেখায়। খুব কাছ থেকে দেখলে 'খ'তচিহ্(গুলো অনেক বেশি করে চোখে পড়ে। সুন্দর দেখতে হলে দূর থেকে দর্শন করাই ভালো। মানুষজন আত্মীয় বন্ধুবান্ধবকেও।

অশোক বলল — উল্টোদিকের পাহাড়ের গায়ে কিছু একটা দেখার জিনিস আছে। লোকজন ভিড় করেছে দেখছেন না? যাই দেখে আসি কি ব্যাপার?

খোঁজখবর করে এসে বলল — দ্রষ্টব্য জিনিসটা কি জানেন, একটি গুহা। নাম বলল গর্ভজুন।

স(গুহা মাত্র পনেরো ফুট লম্বা। খানিকটা সোজা তারপর খাড়া হয়ে গিয়েছে নাকি। ভক্তরা ঐ গুহার মধ্যে একদিক থেকে ঢুকছে, অন্যদিক থেকে বেরিয়ে আসছে। বলছে, যে গুহার মধ্য দিয়ে পুরোটা গলে যেতে পারবে, তার কোন পাপ নেই।

বললাম — গুহা তো আছে। কিন্তু বৃত্তান্তটা কী?

পৌরাণিক বৃত্তান্ত না হলে স্থানমাহাত্ম্য কোথায়? গল্প না হলে তো গৌরব নেই। কাহিনীতে বলা হচ্ছে – এই গর্ভজুনে দেবীকন্যা নাকি নয় মাস বিশ্রাম নিয়েছিলেন। তিনি তখন ভাণ্ডারা থেকে পলায়ন করছেন, পিছনে ভৈরবনাথ ছুটে আসছেন, এমতাবস্থায় নয়মাস বিশ্রাম? কিরকম যেন রহস্যময় মনে হচ্ছে। নয়মাস মানে গর্ভকাল বোঝায়। গর্ভজুনে নয়মাস বিশ্রামের গূঢ় অর্থ বোধ্য হল না। যাই হোক দেবীকন্যা যখন এখানে এসে পৌঁছন, তখন একজন সাধু বসেছিলেন। তাঁকে দেবী বললেন – আমি এই গুহার মধ্যে বসে বিশ্রাম নেব। কেউ খোঁজ করলে বলবেন না যে আমি এখানে রয়েছি।

সাধু বললেন – হ্যাঁ মা তাই হবে।

এদিকে কন্যার অনুসরণ করতে করতে ভৈরবনাথ এসে উপস্থিত। তিনি সাধুকে ঐ কন্যার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁর কাছ থেকে দেবকন্যার হদিশ পেলেন না। বরঞ্চ সাধুটি তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন – আপনি যার সন্ধান করছেন, তিনি সাধারণ কোন মানবী নন। সা(াৎ দেবী।

সাধুর কাছ থেকে সাহায্য না পেয়ে ক্রুদ্ধ ভৈরব নিজেই খোঁজখবর করতে লেগে গেলেন। সামনে গুহা দেখতে পেয়ে তার মধ্যে প্রবেশ করলেন। এদিকে সর্বজ্ঞা দেবীমাতা তো সবই জানেন। বুঝতে পারলেন যে ভৈরবনাথ গুহার মধ্যে প্রবেশ করেছেন। তখন তিনি ত্রিশূল দিয়ে গুহার অন্য প্রান্তে নির্গমপথ বার করে সেখান থেকে বেরিয়ে গেলেন। ভৈরবনাথ আর তাঁর নাগাল পেল না।

গর্ভজুন থেকে বেরিয়ে দেবীকন্যা আরো উপরে চড়াই পথে চলতে চলতে অবশেষে গুহার কাছে তাঁর অধিষ্ঠানস্থলে এসে পৌঁছলেন। গুহার প্রবেশপথে বীর হনুমানকে প্রহরায় বসিয়ে তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন।

ভৈরবনাথও সেই দিব্যকন্যাকে খুঁজতে খুঁজতে এসে উপস্থিত হলেন সেখানে। গুহার ভিতরে প্রবেশ করতে গেলে বাধা দিলেন হনুমানজি। লেগে গেল পবনপুত্রের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ। বলশালী ভৈরবনাথের সঙ্গে বীর হনুমান পর্যন্ত এঁটে উঠতে পারছিলেন না। বুঝতে পেরে স্বয়ং দেবীমাতা গুহার ভিতর থেকে বাইরে এলেন। তারপর তরবারীর এক আঘাতে ভৈরবনাথের মস্তক দেহচ্যুত করে ফেললেন।

এদিকে পণ্ডিত শ্রীধর কুমারী কন্যার ভাণ্ডারা থেকে অদৃশ্য হওয়ার পর খুবই হতাশ হয়ে পড়েছেন। মনকষ্টে স্নানাহার বর্জন করলেন। ভক্তের দুর্দশা দেবীর অগোচর রইল না। তিনি ভক্তের কাছে স্বপ্নে আবির্ভূত হলেন। দর্শন করলেন ত্রিকূট পর্বতগুহায় তাঁর নতুন অধিষ্ঠানস্থল। স্বপ্নে শ্রীধরের মনে হল তিনি দেবীকে অনুসরণ করে ত্রিকূট পর্বতের দিকে চলেছেন।

নিদ্রাভঙ্গ হলে শ্রীধর অনুভব করলেন তাঁর মন স্নিগ্ধ প্রসন্নতায় ভরে উঠেছে। তিনি দেবীর নতুন অধিষ্ঠান খে'ত্রটির খোঁজে বেড়িয়ে পড়লেন ত্রিকূট পর্বতের দিকে। তারপর

একদিন বৈষে(াদেবীর এই গুহাটি আবিষ্কার করতে পারলেন। স্বপ্নে যেমনটি দেখেছিলেন, গুহার মধ্যে ঠিক তেমন করে রয়েছে দেবীর অধিষ্ঠান। তা দেখে তিনি বিস্মিত হলেন। ভক্তিভরে তিনি দেবীমাতার পূজা করলেন। প্রসন্ন দেবী আশীর্ব্বাদ করলেন, শীঘ্রই তাঁর মনষ্কামনা হবে। নিসন্তান শ্রীধরের চারটি সন্তান হল। দেবী আরো বললেন – এখন থেকে আপনি, আপনার সন্তান এবং আপনার বংশধরগণই আমার পূজার্চনার অধিকারী হবে।

গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হল দেবীর অপূর্ব মহিমার কথা। সকল ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করেন যে দেবী তাঁর কথা। আজো পণ্ডিত শ্রীধরের বংশধরগণই বৈষে(াদেবী পূজার সেবায়েত। সেদিন থেকে প্রচলিত হল বৈষে(াদেবীর আরাধনা।

৪।
বৈষে(াদেবী দর্শন

পাহাড় জড়িয়ে জড়িয়ে চলা পাকদণ্ডী পথ। তেমন দুর্গম নয় বটে তবে চড়াই-উৎরাই ভাঙতে হয়। বলা বাহুল্য চড়াই বেশি। ডানহাতে পাহাড়ের ঢল উঁচুতে উঠে গিয়েছে। বাঁহাতে ঢাল নেমে গিয়েছে নিচে, আরো নিচে। সবুজ গাছপালার সমারোহ আছে যথেষ্ট। শীতের সময় মাঝেমধ্যে তুষারপাত হয়।

অধিকাংশ তীর্থযাত্রী পায়ে হেঁটে মহানন্দে চলেছে 'জয় মাতাদি' বলতে বলতে। এমন চমৎকার আবহাওয়া পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। বেশি ঠাণ্ডা নয়, আবার প্রচণ্ড উত্তাপও নেই। মিঠে লাগছে সোনালী রোদের তাপ। প্রথম দিকে চড়াই প্রায় নয় কিলোমিটার রাস্তা জুড়ে। শেষের দিকে খনিকটা সমতল।

ঘোড়ার পিঠে বসে দুলকি চালে চলতে চলতে এক সময় আমাদের যাত্রাও সাঙ্গ হল। পায়ে হাঁটার তুলনায় ঘোড়ায় চড়া এক দিক থেকে বেশি কষ্টদায়ক। একটু পরে পিঠের শিরদাঁড়া টনটন করে। কোমর ভেঙে আধখানা হয়ে যায়। ঘোড়ার পিঠ থেকে নিচে নামার পরে সেসব টের পাওয়া যায়। হাঁটু বাচানো যায় বটে তবে কোমরখানা গেল বলে মনে হয়।

অদূরে মন্দির এলাকা দেখা যাচ্ছে। ডানহাতে। সবুজের মধ্যে সাদা রঙের এক উঁচু ভবন দেখা যাচ্ছে। বেশ কিছু ঘরবাড়ি চোখে পড়ছে। ভাবছি, উঁচু বাড়িটা নিশ্চয়ই হোটেল জাতীয় কিছু হবে। চারদিকে পাহাড় এবং চোখ জুড়োনো সবুজ উপত্যকা। পার্বতীদির ডুলি এসে পৌঁছল একটু পরেই। যেখানে ডুলি নামিয়ে দিল দিদিকে, সেখান থেকে বাকি পথটুকু আমাদের পায়ে হেঁটে যেতে হবে। দেবীর দরবারে পৌঁছতে আর কতো আরামপ্রদ যাত্রা কামনা করা যায়?

দরবার এলাকায় প্রবেশের মুখে আরেক প্রস্থ দেহতল্লাশি হল। আমরা জঙ্গী আতঙ্কবাদী নই তা সুনিশ্চিত হওয়ার পরে তবে আরো এগিয়ে যাওয়ার ছাড়পত্র মিলল নিরাপত্তা কর্মীদের কাছ থেকে।

সামনে এগিয়ে দেখি এলাহি ব্যবস্থাদি রয়েছে মন্দির চত্বরে। শ্রীধরসভা এবং বৈষে(া সেবাসঙঘ দ্বারা নির্মিত হয়েছে এক বিশাল ধর্মশালা। সেখানে ভোজনালয় স্নানাগার শৌচালয় সবই আছে। হাজার তিনেক অতিথির বসবাসের ব্যবস্থা করা যায়। আছে আরো অনেক সুযোগসুবিধা। দূর থেকে এই বিশাল ভবনটি দেখেই আমরা হোটেল বলে ভেবেছিলুম। অশোক অবশ্য অনেক আগে বলেছিল — আমি যতদূর জানি দরবারে কোন হোটেল নেই। ওখানে যাত্রীদের জন্যে বিশ্রামাগার আছে।

পূজার উপকরণাদি কেনা হল। গুহার ভিতরে যেতে হলে সঙ্গে কোন জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া যাবে না। সমস্ত মালপত্র এমন কী টর্চ-ডটপেন পর্যন্ত মন্দিরের ক্লোক(মে জমা করতে হবে। সুর'খ'ার এমনই কড়াকড়ি ব্যবস্থা রাখতে হয়েছে। মালপত্র জমা করে টোকেন নিয়ে ভিতরে ঢোকার লাইনে দাঁড়াতে হল। এখানে আরেকবার যাত্রাস্লিপ চেক করা হবে। দেহতল্লাশি হবে। এতবার দেহতল্লাশি করা হলে যাত্রীরা সাধারণত বিরক্ত হয়। আমরাও সামান্য উষ্মা প্রকাশ করছিলাম। মনে মনে। আবার নিরাপত্তার কারণে বুঝতে পারছি এরকম জবরদস্ত তল্লাশি জ(রী।

লাইনে জনা দশবারো ভক্ত দাঁড়িয়ে। অল্প(ণের মধ্যে ভিতরে যাওয়ার অনুমতি জুটল। এক হলঘরে প্রবেশাধিকার পেলাম। সেখানে আরো কিছু ভক্ত বসে ছিল। কিছু(ণ আমাদেরও বসতে বলা হল।

টিভিতে দেবীপূজা প্রদর্শিত হচ্ছে। ধার্মিক ভক্তরা জয়ধ্বনি দিয়ে চলেছে। ল'খ'্যর কাছাকাছি এসে পৌঁছনো গিয়েছে বলে আরো জোরালো আবেগে তারা জয়গান গাইছিল। সব মিলিয়ে একটা উন্মাদনার সৃষ্টি হচ্ছে। তা থেকে নিজেকে দূরে রাখা শক্ত।

হলঘর থেকে বেরিয়ে আমাদের এক খোলা চত্বরে এসে দাঁড় করানো হল। কিন্তু কোথায় সেই বিখ্যাত প্রাকৃতিক গুহা যার মধ্য দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হবে? এ তো দেখছি আধুনিক কালের মানুষের বানানো টানেল। সিমেন্ট-বালি দিয়ে তৈরি। আমরা তার সামনে লাইনে দাঁড়িয়েছি। একটু পরে অবশ্য জানা গেল যে প্রাকৃতিক গুহাটি রয়েছে অন্যদিকে। আগে হামাগুড়ি দিয়ে সেই গুহার ভিতরে প্রবেশ করতে হত। এখন বাঁদিকের এই টানেল দিয়ে গুহাকন্দরে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। চারজন সেনা গলায় স্টেনগান ঝুলিয়ে ওই টানেলের মুখে পাহারা দিচ্ছে।

লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছি মিনিট পাঁচেক হবে। একদল ভিতরে গিয়েছে। তারা বেরিয়ে গেলে অন্যদল ঢুকবে। এমন সময় কোত্থেকে তীব্র যান্ত্রিক আওয়াজ বেজে উঠল পিঁ

পিঁ করে। কোথা থেকে এই শব্দ এল? অদূরে পাকিস্তান বর্ডার। সেখান থেকে গোলাগুলি ছুটে আসতে পারে ঠিকই। কিন্তু সেরকম শব্দ তো এটা নয়। বোমার সঙ্গে যে টাইমপিস থাকে, সে জাতীয় কিছু নয়তো? প্রহরারত সেনারা মুহূর্তের মধ্যে খটাখট্ শব্দ করে স্টেনগান রেডি করে বাগিয়ে ধরল অশোকের দিকে। আর মুখে বিকট হাঁক দিল — হট যাইয়ে সবলোক।

সবলোককে সরে যেতে বলছে ওরা। আর তাক করে রেখেছে আমাদের অশোক দত্তের দিকে। আমরা নিশ্চিত অশোক জঙ্গী বা আতঙ্কবাদী কোনটাই নয়। কিন্তু আমরা কি ভাবছি না ভাবছি সেটা কিছু ব্যাপার নয়। আসল প্রশ্ন হল ওই সেনারা কী ভাবছে। চারজন চারদিকে যেভাবে পজিশন নিয়ে রয়েছে যে কোন মুহূর্তে ঢ্যাড় ঢ্যাড় ঢ্যাড় করে গুলিবর্ষণ শু(হল বলে।

— ডরিয়ে মত, ইয়ে কুছ নেহি, কুছ নেহি। দেখিয়ে না। বলে অশোক প্যান্টের পকেট থেকে একটা অদ্ভুত রকমের চাবির রিং বার করল। তারপর সেনাদের দেখিয়ে দেখিয়ে বলল — দেখিয়ে ইয়ে কুছ নেহি, চাবি কা রিং হ্যায়। কিসি তরা বটন টাচ হো গিয়া থা, ইসি লিয়ে আওয়াজ নিকলা।

দু তিনবার বাজিয়ে দেখাল আতঙ্কিত সেনাদের। ওরাও দূর থেকে ভালো করে দেখল। তবে নিশ্চিত হল যে বোমা-টোমা জাতীয় ধ্বংসাত্মক জিনিস নেই ওর মধ্যে। তারপর হাতে নিয়ে পরী'খ'া করল। চাবির রিঙের সঙ্গে ফিট করা রয়েছে ইলেকট্রনিক বেল। পকেটে ঘষা লেগে কোন রকমে তার সুইচ-অন হয়ে গিয়েছিল। আর তখন পিলে চমকানো যান্ত্রিক শব্দটা বেজে উঠছিল কলকল করে। দেখেশুনে সেনারা আশ্বস্ত হল। সেনাদলের দোষ নেই যদি তারা এমন অনাকাঙ্খিত ঘটনাকে জঙ্গী কার্যকলাপ জাতীয় কিছু একটা ভেবে নেয়।

আমরা ঘটনার আকস্মিকতায় একেবারে বিমূঢ় বাকশক্তিহীন। সেনারা যেভাবে আর্মস নিয়ে প্রস্তুত হয়ে গেল এক লহমায় ভাবলাম — গুলি চলল বলে। তারা যে ইতিমধ্যে গুলি চালিয়ে বসেনি সেই তো পরম সৌভাগ্য! আরেকটু হলেই হয়ে গিয়েছিল আর কী!

দিদি বলল — অশোক, একটা বড়ো ফাঁড়া কাটল মনে হচ্ছে।

— তা বটে। জোর বাঁচা বেঁচে গিয়েছি আজকে। অশোক স্বীকার করে নেয়।

অতঃপর আমরা টানেলের ভিতরে ঢোকার অনুমতি পেলাম। প্রায় চল্লিশ মিটার লম্বা টানেল। একটা মানুষ সোজা হয়ে চলতে পারার মতো উপযোগী করে তৈরি করা। জানা গেল কাশ্মীরের প্রাক্তন রাজা হরি সিং-এর পুত্র ডক্টর করণ সিং ১৯৭৭ সালে এর উদ্বোধন করেন। মানে মাত্র আঠারো বছর আগে।

টানেলের ভিতর দিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাই। একটু আগে যে ঘটনা ঘটে গিয়েছে, তার উত্তেজনার রেশ তখনো কাটেনি। বুকের ধড়ফড়ানি কমেনি। জয় মাতাদি – তাঁরই কৃপায় দেহে প্রাণ রাখা সম্ভব হয়েছে বুঝি।

ভক্তগণ এসে পৌঁছেছে আরাধ্যা দেবীর পদপ্রান্তে। তিনচারজন করে ছাড়া পাচ্ছে। সুড়ঙ্গের অন্তিম প্রান্তে দেবীর অধিষ্ঠান। নিভৃত গুহাগহ্বরে। অন্ধকার নেই কেননা বিদ্যুৎবাতির আলো জ্বলছে। দেবীর সামনে এসে করজোড়ে দাঁড়াচ্ছে ভক্তরা। পূজার অর্ঘ্য তুলে দিচ্ছে পূজারীর হাতে। আমাদেরও সুযোগ এলো এক সময়।

গহ্বরটি বেশ বড়ো। বাঁ হাতে রয়েছে সামান্য উঁচু প্রস্তরখণ্ড। সেই প্রস্তরবেদীতে আসীন মাতা বৈষে(াদেবী। না, কোন মূর্তি নয়। রয়েছে পাথরের তিনটি ছোট ছোট স্তূপ। এঁদের পিণ্ডি বলা হয়। এই পিঁণ্ডিই দেবীর প্রতিনিধি মানুষের আরাধ্যা। এঁরাই বৈষে(াদেবীর তিন স্বরূপ। দেবীমাতা বৈষে(াদেবীর প্রতীক – মহাল'খখী, মহাকালী এবং মহাসরস্বতী। মহাল'খখী শ্রী, প্রাচুর্য ও সৌন্দর্যের প্রতীক। মহাকালী সকল প্রকার দুষ্টচক্র থেকে ভক্তগণকে র'খা করেন। মহাসরস্বতী জ্ঞান, শি'খা ও সংস্কৃতির প্রতীক। পিণ্ডিত্রয় পুষ্পাদি এবং নানা রত্নালঙ্কারে বিভূষিত। মস্তকে রৌপ্য মুকুট এবং ছত্র। বিশেষ করে মুকুট থেকে জ্যোতি ঠিকরে বে(চ্ছে। একটি মূর্তির মধ্যে একজোড়া ময়ূর। আরো কিছু মূর্তি আছে পাশে। সেসব প্রাক্তন কাশ্মীর রাজাদের দান। পাশে পূজারীরা বসে ভক্তের পূজার ডালি নিয়ে পৌঁছে দিচ্ছেন দেবীর কাছে। পবিত্র অগ্নিশিখা জ্বলছে। শুনেছি এই অখণ্ড জ্যোতি চিরকাল প্রজ্জ্বলিত থাকে। সকাল সন্ধ্যায় দেবীর স্নান, শৃঙ্গার এবং পূজারতি হয়। তখন বোধ হয় যাত্রীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। অবশ্য বিশেষ গণ্যমান্য অতিথিদের ে ত্রে এ নিয়ম খাটে না।

এই হল বিখ্যাত বৈষে(াদেবীর দরবার। দেবীপুরাণ মতে মহিষাসুর বধ করার পরে দেবীমাতা এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। দেবী কখনো রক্ত(বর্ণা কখনো শ্বেতবর্ণা। নয়নে চন্দ্র-সূর্য, বসনে ন'খ'ত্রমালা। বসনপ্রান্তে সবুজ পৃথিবী। দেবীর দরবারে অগণিত ভক্ত(কামনা বাসনা নিবেদন করতে দূরদূরান্তর থেকে ছুটে আসছে।

বরাহপুরাণের কাহিনীতে আছে, ব্রহ্মাসকাশে শিব অন্ধকাসুরের অত্যাচারের কথা বলতে গিয়েছিলেন। পরে সেখানে বিষু(রও আগমন হয়। ত্রয়ী দেবতার নয়নতেজে এক দেবীর আবির্ভাব হল। দেবী তিনদেবতাকে অভিবাদন করলেন। আশ্চর্যের কথা হল দেবীর যুগপৎ তিন বর্ণ – কালো, সাদা এবং লাল। ব্রহ্মা কর্তৃক আদিষ্ট হলে দেবী তিন বর্ণে বিভক্ত হয়ে প্রকাশিত হলেন। শ্বেত বর্ণা দেবী হলেন সরস্বতী, ব্রহ্মার অংশে জন্ম তাঁর। রক্ত(বর্ণা দেবী হলেন ল'খখী, বিষু(র অংশে জন্ম আর কৃষ(বর্ণা হলেন কালি, শিবের অংশে জন্ম তাঁর। কৃষ(া কালিই পরে কনকবর্ণা পার্বতী হয়েছিলেন। বৈষে(াদেবী গুহায় আমরা সেই তিনদেবীর তিনরূপ প্রত্য(করেছি।

আমাদের দেবীদর্শন হল। তাঁর পূজার্চনা হল। পার্বতীদির কথায় – মনপ্রাণভরে। আমার কোন প্রার্থনা নেই। কিছু চাইবার নেই। দুঃখ আছে, তবে তার জন্যে অনুযোগ জানাতে আসিনি। প্রাচুর্য নেই বরঞ্চ জাগতিক পরিমাপে অভাব আছে। তবু তার জন্যে ধনদৌলত আকাঙ্খা করতে আসিনি। তবে কেন এই আসা? আমি দর্শন করতে এসেছি। দেবতা, দেবতার স্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং ভক্তদের।

টানেল দিয়ে প্রবেশ করেছি। ফিরতে হল প্রাচীন গুহার মধ্য দিয়ে। প্রাকৃতিক গুহাটি উঁচু নয়। মাথা নিচু করে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে চলতে হয়। স(পথ। একজন করে চলার মতো। পায়ের নিচ দিয়ে বয়ে চলেছে শীতল স্রোতধারা। এও এক গঙ্গা – চরণগঙ্গা। বৈষ(বী দেবীর বেদীমূল থেকে উৎসারিত ঝর্ণাধারা।

বাইরে এসে পার্বতীদিই বলল কথাটা – মনটা ভরে গেল ভাও। এমন সুন্দর করে পূজো করিনি অনেকদিন।

তিনবছর আগে দোসরা নভেম্বর বড়োজামাইবাবু মদনদাদা গত হয়েছেন। এমন আমুদে জমাট এবং উদার মনের মানুষ সহসা চোখে পড়ার নয়। এতকাল হাসাকাঁদা বেড়ানো পূজোটুজো যা কিছু করা হয়েছে সবই দিদি-জামাইবাবুরা দুজনে মিলে করেছেন। এই প্রথম দিদি একা বেড়াতে বেড়িয়েছে আমাদের সঙ্গে। এই প্রথম একা একা দেবতার কাছে প্রণাম নিবেদন তার। দেবীমাতা তার পূজো গ্রহণ করলেই মনে শান্তিলাভ হবে। আশা করি বৈষ(বী দেবী পার্বতীদিদির পূজা গ্রহণ করেছেন।

অনেক লোকের কাছে অনেক কথা শুনেছি। তারা বলেছে – দেবী যত'খ'ণ ডাক দেন না তত'খ'ণ শত চেষ্টা করলেও নাকি তাঁর দর্শন লাভ হয় না। এমনও হয়েছে যে কাটরা থেকে চড়াই ভেঙে দরবারে এসে লাইনে দাঁড়িয়েও অনেক দর্শনার্থীকে দর্শন না করে ফিরে চলে যেতে হয়েছে। হয়তো জম্মু থেকে ফেরার ট্রেন ধরতে হবে বলে।

অশোক বলল – আমরা সেদিক থেকে ভাগ্যবান। তাই না?

– হ্যাঁ খুব বেশি সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়নি।

– সবথেকে বড়ো কথা অনেকটা সময় ধরে ধীরেসুস্থে সময় নিয়ে দর্শন করতে পেরেছি। এতভালো দর্শন হবে আশাই করিনি। পাবর্তীদি খুবই খুশি।

চকচকে রূপালী সিকি মুদ্রা পাওয়া গেল দেবীর আশীর্বাদ হিসেবে। অশোক বলল – এই গুহার মধ্য দিয়ে তপো মানে আপনাদের ছোট বোন যেতে পারত না। তাই না?

অগ্রজা দুবোনই সমস্বরে বলে উঠল – না না তপো কিছুতেই পারত না।

বোঝা গেল দেবী দর্শন করে তপতীর কথা খুব মনে পড়ছে অশোকের। অসুস্থ বলে সর্বত্র যেতে পারে না তপতী। বিশেষ করে উঁচু পাহাড়ি জায়গায় ওকে নিয়ে যাওয়া যায় না। সবাই যাচ্ছে কিন্তু ওর যাওয়া হচ্ছে না। ঘরবন্দী হয়ে থাকতে হচ্ছে বলে ওর

যেমন মনোকষ্ট হতে পারে, যারা ওকে না নিয়ে ঘুরছে তাদেরও মনোবেদনা থাকা স্বাভাবিক। ভারী আবহাওয়া কাটাতে বললাম – এবার কোথাও বসে খাদ্য গ্রহণ করা যেতে পারে। খুব খিদে পেয়েছে।

দেবতা দর্শনের পরে জলযোগ করার নাকি প্রথাই আছে। ভারতী ব্যাখ্যা করল। আর এমন ব্যাখ্যার পরে অভুক্ত থাকাটা ধর্মীয় অকর্তব্য বলেই বিবেচিত হতে লাগল। হাতেমুখে জল দিয়ে পরিচ্ছন্ন ভোজনালয় দেখে সামান্য জলযোগ করা হল।

বৈষে(াদেবী পর্ব সাঙ্গ হল তাহলে। কী আশ্চর্য হুজুগে হঠাৎ করে বেরিয়ে পড়া। অনেকটা 'উঠল বাই তো কটক যাই' করে। এদিক সেদিক ঘুরে মন্দির চত্বরের কোথায় কি আছে দেখে নিতে আরো আধঘন্টা সময় গেল। বললাম – চলুন এবার নামা যাক।

বৈষে(াদেবী গুহামন্দির থেকে ফেরার পথে অনেকে ভৈরোঁ মন্দির দর্শন করে। আড়াই কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে। পাহাড়ী চড়াই ভেঙে উপরে উঠতে হবে ৬৭৫০ ফুট উচ্চতায়। এই ভৈঁরো তথা ভৈরবনাথের মন্দিরের প্রসঙ্গে কিছু কথা আছে। জেনে নেওয়া যাক।

পণ্ডিত শ্রীধরের ভাণ্ডারা থেকে বৈষে(াদেবীর পিছনে ধাওয়া করেছিলেন যিনি, তিনিই হলেন এই ভৈরবনাথ। দেবী তাঁর মস্তক তরবারী দিয়ে ছিন্ন করেছিলেন। আঘাতের তীব্রতায় সেই ছিন্নমুণ্ড উড়ে এসে পড়েছিল পাহাড়ের উঁচু চূড়ায়। মৃত্যুর পরে ভৈরবনাথের অনুশোচনা হয়। তিনি দেবীর কৃপা প্রার্থনা করেন। দেবীর হাতে মরণকে অসীম সৌভাগ্য বলে মনে করতে থাকেন। বলেন – হে দেবী, আপনার কৃপা না হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ভৈরবনাথকে শুধু ঘৃণাই করবে। কলঙ্কমুক্ত(হব না আমি।

প্রসন্ন হয়ে দেবী তাঁকে বলেন যে তাঁর আত্মার মো'খ'প্রাপ্তি হবে। আরো বলেন যে বৈষে(াদেবী দর্শনের পরে ভক্ত(রা ভৈরবনাথকেও দর্শন করবেন।

যেখানে ভৈরবনাথের ছিন্নমস্তক পড়েছিল সেই জায়গার নাম হল ভৈরবঘাঁটি। প্রথা অনুসারে দেবী দর্শন করে ঐ ভৈঁরো মন্দির প্রণাম করতে হয়।

আমরা ভৈঁরো মন্দির যাব না। নিচ থেকে প্রণাম করেই বিদায় জানাতে হবে। অধিকাংশ যাত্রী তাই করে। সমস্ত ধর্মীয় প্রথা মেনে এখন খুব কম মানুষের পখে' তীর্থযাত্রা সম্ভব হয়। আধুনিক নাগরিক জীবন অতীব জটিল। বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী চর্চা বিশ্বাসের একান্ত শিকড় ধরে টান দিচ্ছে। জীবিকার জন্যে তাদের প্রবল প্রতিযোগিতা। সময়ের ভয়ানক অভাব। সুতরাং আপোষ সর্বত্র। প্রার্থীর প্রয়োজনের জন্যে পুরোহিতদের বিধান বদলাতে বিলম্ব হয় না, বিনিময়ে মূল্য ধরে দিলেই চলে। সেও তো আপোষ।

হাতে অনেক সময় আছে। ঘোড়ায় চড়ে নিচে নামার দরকার নেই। পার্বতীদিদি ডুলি চেপে নেমে যাবে। নিচে নেমে অপে'খ'া করবে।

আমরা তিনজনে পায়ে হেঁটে পাহাড় থেকে নিচে নামতে শু(করলাম। কখনো সিঁড়ি ভেঙে, কখনো পাথর টপকে টপকে শর্টকাট করে। আমরা পর্বতারোহী নই বটে তবে ছোটবেলা থেকে পাহাড়ে এলোমেলো দৌড়োদৌড়ি করতে উৎসাহের অভাব হয়নি কখনো।

শহুরে মানুষদের ট্রামে-বাসে চড়া অভ্যাস। নামতে নামতেই টের পাচ্ছি পা ভারী হচ্ছে। কোমর মাজা চুরচুর হচ্ছে। বয়স অনিবার্য কামড় বসাচ্ছে দেহযন্ত্রে। ইচ্ছের সঙ্গে সাধ্যের সংঘাত শু(হয়ে গিয়েছে। সাধ্য হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু তা মেনে নিতে প্রবল আপত্তি মনের।

বোধ হয় একটু বেশি তাড়াতাড়ি নামা হয়েছিল। নিচে নেমে অনেকটা সময় বসে থাকতে হল। পার্বতীদির ডাণ্ডি নামেনি তখনো। ভাবছি এমনটা তো হওয়ার কথা তো নয়। পাহাড়ীরা আমাদের থেকে চড়াই-উৎরাই ঠেঙাতে অনেক বেশি দ'খ'। তাদের তো আগেই নেমে পড়ার কথা। তবে কী হল? দেরি যতো হচ্ছে আমাদের দুশ্চিন্তাও ততো বাড়ছে।

অবশেষে আমরা পার্বতীদিদির দেখা পেলাম। উনি আগেই মর্ত্যে আগমন করেছেন। অন্যত্র বসেছিলেন বলে তাঁর দেখা পাইনি। উভয় প'খ' উভয়কে খানিকটা কৃত্রিম দোষারোপ করতে লাগল। তারপর ধীরপায়ে বাংলোর পথ ধরলাম। জোরে চলার সামর্থ্য নেই আর।

রাত অতিবাহিত হল কাটরা বাংলোয় নির্ভেজাল বিশ্রামে। তা ছাড়া অন্য কিছু ভাবনার অবকাশ ছিল না। শরীর একদম বইছে না। সর্বাঙ্গে প্রবল বেদনা। চরণ দুটি সবথেকে বেশি বিদ্রোহী। শহুরে কোমলাঙ্গে এত পথশ্রম কি সয়?

অশোক খোঁজখবর করে এসে জানাল আগামীকাল সকালে আটটা নাগাদ জম্মুর বাস পাওয়া যাবে। জম্মু থেকে চাম্বার বাস ধরতে হবে। সোজাসুজি কোন বাস পাওয়া যাবে না। চাম্বা আরো ঠাণ্ডার জায়গা। ওখানে বসে দুদিন বিশ্রাম নেওয়া যাবে তাহলে।

৫।
চাম্বা

৫ই এপ্রিল। বাসস্ট্যাণ্ডে এসে ঠিক হল যে কাটরা থেকে বাসে জম্মু না গিয়ে একেবারে পাঠানকোট চলে যাব। জম্মু থেকে পাঠানকোট ১০৮ কিলোমিটার। কাটরা থেকে মোট দূরত্ব ১৫৬ কিলোমিটার। সরকারী বাসের খোঁজ করতে করতে পেয়ে গেলাম লাক্সারি কোচ। ভাড়া সামান্য বেশি নেবে – ১০০ টাকা করে। ওরা পাঠানকোট

বাস টার্মিনাস পর্যন্ত না নিয়ে গিয়ে আমাদের কোন এক রাস্তার মোড়ে নামিয়ে দেবে। সঙ্গে খাঁটি ভরসা, ওখান থেকে সমস্ত বাস চাম্বা যাবে। শুধু তাই নয় বাসে বসার জায়গা পর্যন্ত যে পাওয়া যাবে তাও সুনিশ্চিত।

জনতার উপদেশ শিরোধার্য করে লাক্সারী বাসে চড়ে বসলাম। একটু আরামে চলার লোভ সামলাতে পারছি না। গা-হাত-পা মসমস করছে।

লোকজনের ওঠানামা নেই। হু হু করে বাস ছুটল। জম্মু হয়ে এই জাতীয় সড়ক চলে গিয়েছে একেবারে দিল্লি। বাস জম্মু এড়িয়ে সাম্বা হয়ে খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেল পাঠানকোটের কাছে। আমাদের এক অচেনা রাস্তার মোড়ে নামিয়ে দিল ভর দুপুরবেলায়।

ঠা ঠা করছে রদ্দুর। ঝুপড়ি এক চায়ের দোকানে বসে মাথা বাঁচানোর চেষ্টা করছি। ভাবছি সত্যি এখান থেকে বাস পাব তো! অবিশ্বাসী মন আমাদের। পদে পদে ভয় সন্দেহ আশঙ্কায় জর্জরিত। ওদের ভরসা মিথ্যে ছিল না। অল্প কিছু সময়ের মধ্যে হিমাচল সরকারের বাস পেয়ে গেলাম। বসার আসনও সেই সঙ্গে।

পাঠানকোট থেকে চাম্বা – পথের দূরত্ব ১২২ কিলোমিটার। বাসভাড়া পড়ল ৪৯ টাকা মাথাপিছু। পৌনে এক ঘন্টা চলার পরে ৪৩ কিলোমিটার দূরে পেলাম দুনেরা। উত্তপূর্বে আরো ২৮ কিলোমিটার দূরে রয়েছে বানিখেত। এখান থেকে ডানদিকে ডালহৌসির পথ চলে গিয়েছে। সেদিকে যাব না আমরা। সোজা এগিয়ে যাব পূর্বদিকে আরো ৪৮ কিলোমিটার রাস্তা পেরোতে।

শৈলশহর ডালহৌসি ডানদিকে রেখে ইরাবতী নদীর তীর ধরে চলেছি। উত্তরে পীরপঞ্জাল পর্বতমালার তুষার ঢাকা শৃঙ্গমালা। সারাপথ আমাদের সঙ্গী হয়ে চলল। ইরাবতী মানে রাভি। কোথা থেকে এ নদীর জন্ম হল? ধৌলাধার-পীরপঞ্জালের অন্তর্বর্তী গিরিমালার বড়াবাঙ্গহাল তুষারখেত থেকে এর উদ্ভব। কোথায় এ বিলীন হল? বিপাশা-শতদ্রুর মিলিত স্রোতের সঙ্গে যুক্ত(হয়ে বিলীন হয়েছে ঝিলাম-চন্দ্রভাগার মিলিত স্রোতে। তারপর এই পঞ্চনদী আত্মহারা হয়েছে সিন্ধুনদে।

পাহাড়ী পথে চলাতেই আনন্দ। নদীর তীর ধরে চলতে চলতে সবুজ বনানীর মুগ্ধতায় হারিয়ে যেতে যেতে পাহাড়ের তরঙ্গদোলে ভাসতে ভাসতে আমরা সময় ভুলেছি। খিদে জয় করেছি। বিশাল বিপুল হিমালয়ের গর্ভে বিলীন হচ্ছি আরো আরো গভীরতায়। সভ্যতা থেকে দূরে। শহুরে কলকোলাহল থেকে দূরে। বিজন থেকে বিজনতর ভূখণ্ডে।

বাস এক সময় নদীর তীরের কাছে নেমে এল। ব্রিজ পার করে একটু উঁচুতে উঠে যাত্রা সাঙ্গ করল। পুরোনো ব্রিজের পাশে নতুন করে আরো মজবুত সেতুনির্মাণের কাজ চলছে, দেখলাম।

কোন সকালে কাটরা থেকে যাত্রা করেছি। চাম্বা পৌঁছতে বিকেল গড়িয়ে গেল। প্রায় ৯৯৬ মিটার বা ৩,৩০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত ছোট্ট শহর চাম্বা। বলা হয়, ল্যান্ড অব

মিল্ক অ্যান্ড হানি – দুধ এবং মধুর দেশ। পথে তার পরিচয় পেয়েছি দুনেরায় দইবড়া খেয়ে। নিতান্ত পথচলতী এক ভ্যানগাড়ি থেকে বিত্রি(করা ওরকম সুস্বাদু দইবড়া বহুকাল মনে থাকবে।

ইরাবতীর উত্তর তীরে অনেকটা উঁচুতে ছবির মতো আঁকা ছোট্ট পাহাড়ী উপত্যকা। তার সবুজ ঢলে বসানো শহরটিকে প্রথম দর্শনেই দারুণ ভালো লেগে গেল। চারদিকে শুধু নীরব নিস্তব্ধ পাহাড় আর পাহাড়। সবুজ শ্যামলিমায় আবৃত। দুদিকে ধবল বরফে ঢাকা ঝলমলে পর্বতশৃঙ্গ। কোন কিছুই কোলাহলমুখর নয়।

বাস আড্ডা থেকে সামান্য এগোতে চোখে পড়ল সবুজ একফালি মাঠ। এর নাম চৌগান। ডানদিকে উঁচু হয়ে উপরে উঠে গিয়েছে পাহাড়ের ঢল। তার নানা উচ্চতায় নানা বর্ণের ঘরবাড়ি। পাহাড়ী বাড়ি যেমন হয় আর কী। নিভৃত সবুজের সমারোহের মধ্যে। দীর্ঘদেহী গাছপালা।

হিমালয়ের এই সকল এলাকা শুনেছি য'খ', গন্ধর্ব ও কিন্নরদের দেশ। য'খ'-গন্ধর্বরা এখন কোথায় থাকে জানি না তবে কিন্নরদেশ আছে পূর্ব হিমাচল প্রদেশে – কল্পা-সাংলা এলাকায়। এর উত্তরে পার্বতী ও স্পিতি উপত্যকা। হিমাচল প্রদেশের মধ্যভাগে প্রধান তিনটি উপত্যকা – উত্তরে চাম্বা উপত্যকা, পশ্চিমে কাংড়া উপত্যকা এবং মধ্যে কুলু উপত্যকা। কুলু ও চাম্বার উত্তরে লাহুল ও পাংগি উপত্যকা। বিপাশা নদী কুলু উপত্যকায়, ইরাবতী চাম্বা উপত্যকায় এবং চন্দ্রভাগা লাহুল-পাংগি উপত্যকায়।

দশম শতকে এখানকার রাজা ছিলেন জনৈক শাহিল ভার্মা। তাঁর রাজধানী ছিল সত্তর কিলোমিটার দূরে ভারমোর। তাঁর একমাত্র কন্যার নাম চম্বা বা চম্পাবতী। রাজার সঙ্গে শিকারে বেরিয়ে রাজনন্দিনী এই চাম্বার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন এবং রাজাকে রাজধানী সরিয়ে চাম্বায় আনতে বাধ্য করেন। এক লৌকিক কাহিনী অনুসারে সেসময় চাম্বার নদীতে জলধারা প্রবাহিত হত না। দেবতারা যাতে উপত্যকায় অঢেল জলপ্রবাহের ব্যবস্থা করে দেন, তার জন্যে রাজকন্যা স্বয়ং আত্মবলি দেন। দুঃখী রাজা চম্পাবতীর নামে নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন এখানে। প্রতি বছর এপ্রিলমাসে সেকথা স্মরণ করে এখনো চৌগানে সুহী মেলা বসে। মেয়েরা এবং শিশুরা বেশি করে সেখানে আসে। তারা সতী চম্পাবতীকে স্মরণ করে প্রণাম জানায়। রামমোহন রায় কোনকালে সতীপ্রথা রদ করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। তবু আজো সনাতন ভারতীয় সমাজে সতীর মাহাত্ম্য প্রবল। আমজনতা একে বধূহত্যা বা নারীহত্যা বলে ভাবতে চায় না।

সরকারী হোটেল আছে দুটি। বহুমূল্য হোটেল ইরাবতীতে আমরা আশ্রয় নিলাম। দৈনিক ভাড়া ৫০০ টাকা। অন্যটি হোটেল চম্পক। আমরা তিনজনে আরেকটু কম ভাড়ায় স্বস্তি বোধ করতুম হয়তো। পার্বতীদি পড়ত বেজায় অস্বস্তিতে। তবে মূল্যবান ঘরের বড়ো সুবিধা হল এই যে ঘরের মধ্যে এমন (মহিটার জ্বালিয়ে শরীর ভাজতে পারা যেত

না অন্যত্র। বৈষে(াদেবী পাহাড়ে হাঁটার বেদনা এখনো সর্বাঙ্গে রমরম করছে। মৌজ করে চেয়ারে বসে দেহখানি এমন করে সেঁকতে দা(ণ ভালো লাগছিল।

পরদিন চাম্বার মূলমন্দির কমপে-ক্স দেখতে গেলাম। রাজপ্রাসাদের কাছে মনিগর চত্বর। অনেক মন্দির এখানে। শিখরধর্মী এবং দেশীয় দুরকম গড়নের মন্দির আছে। তার মধ্যে ছয় চূড়ার লছমি-নারায়ণ মন্দির হল প্রধান। পাশে রাধাকৃষ(ও লছমিদামোদর মন্দির, বিষু(মন্দির এবং গৌরীশঙ্কর মন্দির। বোধ হয় তিনটি বিষু(মন্দির এবং তিনটি শিব মন্দির রয়েছে। আছে অষ্টম-দশম শতকের বংশীগোপাল মন্দির এবং শ্রীবজ্রেশ্বরী মন্দির। মন্দির স্থাপত্যে জটিলতা নেই। দেবতার পীঠস্থান গর্ভগৃহে এবং তার সামনে অন্তরালের মতো একটু জায়গা রয়েছে। মূলমন্দিরের বিমান রেখদেউলের মতো আকাশগামী। উপরে কলস ও পতাকা। অন্তরালের আচ্ছাদন দোচালা। তবে পার্বত্য এলাকার বিশেষ রীতি অনুসারে শিখরশীর্ষ তুষারপাত থেকে বাঁচার জন্য ছত্র-শোভিত।

বিষু(এবং শিব এদিকের প্রধান উপাস্য দেবতা। চাম্বার ত্রিলোকনাথ মন্দির নির্মাণ নিয়ে কাহিনী প্রচলিত আছে। এক যশস্বী শিল্পী মানালীতে অপূর্ব হিড়িম্বা মন্দির তৈরী করেছিলেন। করেই তাঁর কাল হল। সেখানকার লোকেরা শিল্পীর ডান হাতখানি কেটে ফেলল যাতে তিনি আর ওরকম সুন্দর মন্দির না গড়তে পারেন। 'খু'ব্ধ ব্যথিত শিল্পী চাম্বায় এসে বাঁ হাতখানি কাজে লাগিয়ে ত্রিলোকনাথ মন্দির নির্মাণ করেন। হয়তো তাঁর প্রাপ্ত শাস্তির প্রতিবাদ স্বরূপ। সে মন্দিরটিও দর্শনীয় হল। এবার চাম্বাবাসীরা তাঁর মাথাটিই কেটে ফেলল যাতে ত্রিলোকনাথ মন্দিরই তাঁর শেষ কীর্তিরচনা হয়। সুন্দর মন্দির গড়ার শ্রেষ্ঠ পুরষ্কারই বটে লাভ হয়েছে শিল্পীর জীবনে।

লছমিনারায়ণ মন্দিরের অদূরে রয়েছে রাজা উমেদ সিংয়ের রাজপ্রাসাদ — আখণ্ড চাঁদী প্রাসাদ। অষ্টাদশ শতকে নির্মিত হয়েছিল। রাজত্ব করে গিয়েছেন জিৎ সিং ও চরৎ সিং। বর্তমানে শি'খ'াকেন্দ্র। বসেছে চাম্বা কলেজ। তার উপরের ধাপে রয়েছে রঙমহল। আর আছে চম্পাদেবীর মন্দির। সেও আরেক কাহিনী। রাজা শাহিল ভার্মার কন্যা রোজ রাতে যেতেন সাধু গুরুর কাছে পাঠ করতে। একদিন রাজা সন্দেহের বশে গুরুগৃহ পর্যন্ত কন্যার অনুসরণ করেন। দেখেন গুরুগৃহ শূন্য। তখন দৈববাণী মারফৎ রাজা জ্ঞাত হন যে কন্যা ও গুরু লীন হয়ে গিয়েছে। চম্পাবতীর মন্দির সেই গুরুগৃহে নির্মিত হয়েছে। সিংহবাহিনী ষড়ভুজা দুর্গাই আরাধ্যা দেবী চম্পাবতী।

সবুজ ঘাষে ঢাকা চৌগান শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। এটি আসলে রাজার প্রমোদ উদ্যান। দৈর্ঘ্যে প্রায় এক কিলোমিটার হবে। প্রস্থে অতটা নয়। তার এক প্রান্তে রয়েছে একটি বিষু(মন্দির — হরি রাই মন্দির। মন্দিরে ব্রোঞ্জের চতুর্ভুজ মূর্তিটি একাদশ শতকের অন্যতম শিল্পকীর্তি।

চৌগানের আরেক পাশে খাদ নেমে গিয়েছে ইরাবতীর কোলে। প্রায় খাঁড়াই সেই অবনমন। খাদের কিনারায় এক রেস্তোরা পেলাম। সেখান থেকে ইরাবতীর কলকল্লোল ভারী সুন্দর দেখা যায়। ওপারে ডালহৌসি থেকে আসা সড়কপথ — আরেকটু এগিয়ে ইরাবতীর ব্রিজ পেরিয়ে উত্তর তীরে এসে উঠেছে চাম্বায়। গাড়ি চলছে সেই পথ দিয়ে। আমরাও তো ওই পথে এসেছি এখানে।

এখানকার ভূরি সিং মিউজিয়াম নাকি দেখার মতো। কাংড়া পেন্টিং এবং বাসোলী স্কুল অব আর্টসের চমৎকার সংগ্রহ আছে। চাম্বার (মাল বা কশিদা নামকরা শিল্পসামগ্রী। দুদিক থেকে তার কা(কাজ একই রকমের দেখা যাবে। আগস্ট মাসে এখানে বসে গদ্দীদের উৎসব মিঞ্জর মেলা। এক সপ্তাহ ধরে। চাম্বাবাসীরা তখন উৎসবের রঙিন পোষাকে সমবেত হয়। নানা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব শেষে ইরাবতীর জলে মিঞ্জর ভাসান দেওয়া হয় ধুমধাম করে।

চাম্বার যেদিকে যাওয়া যাক না কেন সারা'খ'ণ মণিমহেশের তুষারশুভ্র শৃঙ্গ হাতছানি দিয়ে থাকে। আরো কিছু বরফে-মোড়া চূড়া এদিক ওদিক থেকে উঁকি দিচ্ছে। ট্রেক করে যাওয়া যায় হিমালয়ের গহন প্রদেশে ত্রিলোকনাথ বা পাংগী উপত্যকায়, অথবা মানালী ধরমশালা খাজিয়ার-ডালহৌসিতে।

চাম্বা থেকে শৈবতীর্থ মণিমহেশ যেতে হয়। উচ্চতা ৪৩০২ মিটার। নিচে মণিমহেশ হ্রদ ৪১৭০ মিটার উচ্চতায়। আর আছে কৈলাস পর্বতশৃঙ্গ। ৫৬৫৬ মিটার উঁচু। চাম্বা থেকে খাড়ামুখ-ভারমোর-হাডসার হয়ে ট্রেকিং করে যেতে হবে কৈলাসে। দূরত্ব ১১৫ কিলোমিটার।

কৈলাস শিখর তো দূরস্থান, মণিমহেশ পর্যন্ত পৌঁছনোই আমাদের আর সম্ভব নয়। ট্রেকিং করে গৌরীকুণ্ড পর্যন্ত যেতেও পারব না। তবে ঐ পথে প্রাচীন রাজধানী ভারমোর (২১৯৫ মিটার) যাওয়ার খুব ইচ্ছে ছিল। জিপ যায় ভারমোর পর্যন্ত। প্রায় চৌষট্টি কিলোমিটার দূরত্বে। ওখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নাকি অসাধারণ! যেকারণে ভারতের সুইজারল্যাণ্ড বলা হয় ভারমোরকে। প্রাচীন নাম ব্রহ্মপুর। তা থেকে ভারমোর। মূলত মেষপালক গদ্দী উপজাতিরা বাস করে।

প্রবাদ অছে শাহিল ভার্মার কালে চুরাশী জন যোগী এসেছিলেন। তাঁরা রাজার সেবাযত্নে তুষ্ট হয়ে রাজাকে দশ পুত্র এবং এক কন্যা আশীর্বাদ করে যান। সেই কন্যার নামই চম্পা। চুরাশী জন যোগীর জন্য নির্মিত হয়েছিল চুরাশীটি শিবমন্দির। তার কিছু অবশিষ্ট আছে চৌরাশিয়া মন্দিরপ্রাঙ্গণে। মণিমহেশের শীতকালীন মন্দিরও এখানে। আছে পঁচিশ মণ ওজনের অষ্টধাতুর বিপুলাকার নন্দী মূর্তি।

ভারতের কৈলাস মণিমহেশ আরো পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরে। বলা হয় একদা শিব মুসলমানদের অত্যাচারে অমরনাথ ত্যাগ করে মণিমহেশে চলে যান। সেখানে মন্দির

নেই। আছে ত্রিশূল কয়েকটি। পার্বতীদিকে নিয়ে ঐপথে যেতে ভারতী সাহস করলাম না। সুতরাং এ যাত্রায় ভারমোর না দেখেই চাম্বাকে বিদায় জানাতে হল।

৬।
খাজিয়ার

পরদিন ৭ই এপ্রিল। সকালেই আমাদের খাজিয়ার যাওয়ার কথা।

চৌগানের সামনে প্রাইভেট গাড়ির আড্ডা। বাসের ভরসা না করে ঠিক করেছি মা(তি ভ্যান ভাড়া করে খাজিয়ার হয়ে ডালহৌসি যাব। মোট ভাড়া পড়ল ৪৭৫ টাকা।

চাম্বা থেকে বানিখেত হয়ে ডালহৌসির দূরত্ব ছাপ্পান্ন কিলোমিটার। কিন্তু চাম্বা থেকে পশ্চিমদিকে খাজিয়ার ছাব্বিশ কিলোমিটার এবং খাজিয়ার থেকে ডালহৌসি বাইশ কিলোমিটার। তাহলে এপথে আমাদের যেতে হচ্ছে মোট আটচল্লিশ কিলোমিটার রাস্তা। গাড়ির ভাড়া সস্তাই হয়েছে বলতে হবে। আসলে এদিকে ট্যুরিস্ট সিজন শু(হয়নি। ফলে মন্দার বাজার চলছে। কথা হয়েছে, গাড়ি চাম্বার চামুণ্ডা দেবীর মন্দির দেখিয়ে তারপর খাজিয়ার নিয়ে যাবে।

বাসস্ট্যাণ্ডের উপরের দিকে পাহাড়ের কোলে চামুণ্ডা মন্দির। সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয়। কাঠের প্রাচীন মন্দির। শান্ত সুন্দর পরিবেশ। ইরাবতী নদী এবং চাম্বা শহর দারুণ দেখায়। নদীর ওপারের গ্রাম (ে তখামার সবুজ রাজ্য। গাড়ি অপে(া করবে না, নয়তো এখানে আরেকটু সময় বসা যেত।

ইরাবতীকে ডানহাতে রেখে পাহাড়ের শিখরদেশে ঘুরে ঘুরে চলা। এগুলো ধৌলাধার পাহাড়শ্রেণী।

খাজিয়ার ছোট্ট জনপদ। আয়তনে বড় জোর দু' কিলোমিটার লম্বা আর এক কিলোমিটার চওড়া। পর্যটকদের কাছে ভীষণ আকর্ষণীয় জায়গা হয়ে উঠছে। সমুদ্রতল থেকে উচ্চতা মাত্র ১৯৫১ মিটার। অর্থাৎ ৬৪০০ ফুট। কি আছে এখানে? সবুজ প্রকৃতি আছে। অথবা এক কথায় অনাবিল প্রশান্তি আছে। চোখের আরাম আর মনের শান্তি।

চারদিক দিয়ে পাহাড়-ঘেরা। মণিমহেশের তুষারাবৃত শৃঙ্গ দেখা যাচ্ছে। গাঢ় সবুজে ঢাকা কচি সবুজে উপত্যকা। নরম সবুজ ঘাষে মোড়া উদাস প্রান্তর। অদূরে পাইন ওক আর দেবদা(র ঘন বন। চারদিকে থেকে ঘিরে রেখেছে শান্তির প্রান্তরটিকে। এত স্নিগ্ধ সবুজ পরিবেশ সহসা চোখে পড়ে না।

চতুর্দিক থেকে গড়ানে ঢাল নিচে নেমে গিয়েছে একখণ্ড সবুজ প্রান্তরে। অনেকটা কড়াইর মতো। মাঝখানে ছোট্ট একটা হ্রদ। জল প্রায় নেই বললেই চলে। আরো একটু জল থাকে অন্য সময়। তার মধ্যে রয়েছে আবার একটি ভাসমান দ্বীপ। মাটি-শ্যাওলা-লতাগুল্মর জটলা দিয়ে গড়া। দারুণ সুন্দর জায়গা। এক কথায় অনবদ্য।

হ্রদের চারধারে শুয়েবসে থাকা যায়। ঢালু জমির ওপর। অলস মায়ায় সময় ব্যয়। মাথার উপরে নীল ঘননীল আকাশ। সাদা মেঘের পুঞ্জ ভেসে বেড়াচ্ছে। হালকা শীতার্ত ঝিরঝিরে বাতাস। নরম মিষ্টি রোদে গা রাঙাতে কী ভালো যে লাগছে। আমরা বসে পড়লাম সেই গড়ানো ঢালে। শরীরে ঝিম লাগছে। শুয়ে শুয়ে নীলাকাশ আর দূরের সবুজ পাইন-দেওদার বন দেখতে দেখতে চোখ জুড়িয়ে আসে।

অদূরে দ্বাদশ শতকে নির্মিত মন্দির আছে। খাজিনাগের মন্দির। কাঠের কাজ খুব সুন্দর। সোনায় মোড়া চূড়া। আশ্চর্য লাগল যে মন্দিরের ভিতরে পঞ্চপাণ্ডবের কাঠের মূর্তি রয়েছে। পঞ্চপাণ্ডব পূজিত হওয়ার কথা বিশেষ শোনা যায়না। এদিকে কোথাও নাকি দুর্যোধনের মন্দিরও আছে। তবে কী পাণ্ডব-কৌরবের বংশধরগণ এখানে আশ্রয় নিয়েছিল? লোকবিশ্বাস — হ্রদের জলে খাজিনাগের বাস। এখানে নয়-হোলের গলফ কোর্স আছে বলেও শুনেছি।

খাজিয়ারে থাকার জায়গা অনেক নয়। হোটেল দেওদার সরকারী ব্যবস্থাপনায় চলে। কিছু প্রাইভেট হোটেলও আছে। জেনে রাখা ভালো এখানে বেড়াতে এসে সঙ্গে সঙ্গে চলে যেতে নেই আমাদের মতো। থাকতে হবে। অন্তত একটা দিনরাত। হৃদয়ে শান্তির আকুতি যদি প্রার্থিত হয় তবেই। হৈ হৈ করার জায়গা এটা নয়। সব বুঝেও আমরা অসহায়। আমাদের ব্যস্ত (টিনে সময় নেই। কয়েক ঘন্টা কাটানো গেল মাত্র। খাজিয়ার তাই সত্যি কথা বলতে কি আমাদের কাছে অধরা রয়ে গেল।

খানিকটা দুঃখ নিয়ে শৈলশহর ডালহৌসির পথ ধরলাম। আবার ধৌলাধার পর্বতমালার শিরা ধরে চলা। পাহাড় থেকে পাহাড়ে। রাস্তার ধারে কোথাও কোথাও বরফ জমেছে কয়েক খণ্ড। গ্রামের পথে যেমন বনফুল ফুটে থাকে অনেকটা তেমন করে। পথের ধারে এমন করে বরফকুঁচি জমা আগে কখনো দেখিনি। এক নতুন অভিজ্ঞতাই হল।

উপরে পাহাড়ের ঢলেও কুঁচি কুঁচি বরফ জমেছে। কালো কালো পাথর ঢাকা পড়েছে সাদা বরফে। ধবধবে সাদা আর কুচকুচে কালোয় সে এক উজ্জ্বল কনট্রাস্ট। এমন করে একটু একটু করে সাদা হয়ে ওঠা — বেশ লাগছে দেখতে। মনে হচ্ছে আস্তে আস্তে বরফ জমছে।

এক জায়গায় দেখি দুই পাহাড়ের কোলে পুষ্ট বরফের ঢল। অনেকটা উপর থেকে নিচের রাস্তা পর্যন্ত নেমে এসেছে। হিমবাহের মতো। দীর্ঘকায় চির দেবদারুরা তারই

মধ্যে এক পায়ে দাঁড়িয়ে। তাদের মাথায় বরফের আশীর্বাদ। এ সব দৃশ্য তো সুইজারল্যাণ্ডের ছবিতে দেখা যায়।

গাড়ি থেকে নেমে এমন বরফের রাজ্যে একটুও দাপাদাপি না করলে চলবে কেন? আরো দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে। অশোক ছুটল সবার আগে। তার পিছনে আমি। তারপর ভারতীও দৌড়োলো। উপরে উঠবে বলে। পারছে না — ঢালে পা না রাখতে পেরে নিচে গড়িয়ে পড়ছে। তবু উঠবে।

সেসব দেখেশুনে পার্বতীদিও আর কত'খ'ণ গাড়িতে বসে থাকবে? বলল — ভাও, আমি যাব।

একথা বলে নেমে পড়ল সেই বরফের দেশে।

৭।
ডালহৌসি পাহাড়

পাঁচটি ছোট পাহাড় নিয়ে পাহাড়ী শহর ডালহৌসি। ভঞ্জর, পাতরেন, বাকরোটা, তেহরা এবং কালগ — সেই পাহাড়গুলোর নাম। সমগ্র ডালহৌসিও পাঁচটি এলাকায় বিভক্ত — বালুন, কাঠলোয়াং, পাতরেন, তেহরা এবং বাকরোটা।

ওক পাইন আর দেবদারুতে ছাওয়া রূপসী ডালহৌসি। ২০৩৬ মিটার উঁচুতে অবস্থান। ফুটের হিসেবে ৬৬৮০। একদিকে ধৌলাধার পর্বতশ্রেণী কাংড়া উপত্যকা থেকে উঁচুতে উঠেছে — প্রায় ১৮,০০০-২১,০০০ ফুট উঁচুতে। অন্যদিকে পীরপঞ্জাল পর্বতশ্রেণী কাশ্মীর উপত্যকায় প্রহরারত। এই দুয়ের মাঝখানে বয়ে চলেছে বিভাজিকা ইরাবতী।

খাজিয়ার থেকে ডালহৌসির পথে পড়ে কালাটপ অভয়ারণ্য। উইলো পাইন আর ওক গাছের বনাঞ্চল। দেখা মেলে চিতা চিতল হরিণ সম্বর ধূসর ভালুক হায়না ময়াল ইত্যাদি জন্তুর। ঘোড়েল এবং হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ারের বাসভূমি এই এলাকা।

ডালহৌসিতে তখনো পর্যটকদের মরশুম শু(হয়নি। হোটেলের সাজসজ্জা চলছে। ফলে আমাদের অতিথি হিসেবে পেয়ে হোটেল মালিকদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। গান্ধীচকের কাছে হোটেল মুনলাইট নামে কোন একটি হোটেলে আস্তানা পাতা হল। তেহরা লোয়ার বাকরোটার কাছে। ট্যুরিস্ট-ব্যুরো, ট্যুরিস্ট-বাংলো ও বাসস্ট্যাণ্ড এদিকে নয়। ওসব বেলুন বাজার এলাকার দিকে। সেনা ক্যান্টনমেন্টও নাকি ওদিকটায়। গান্ধীচকের মতো এখানে সুভাষচক আছে। কাছেই সদর বাজার।

বিকেল বেলা দেখা হল সুভাষ বাউলি। জানদ্রিঘাট রোড ধরে এগোলে পড়ে এই ঝর্ণা। এখানে এক সময় দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসু এসেছিলেন এবং এই বাউলির জলপান

করেছিলেন ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্যে। ১৯৩৭ সালের শরতকালে। আগের বছর দীর্ঘ ইউরোপ সফর করে দেশে ফিরে এসেছিলেন। ইংরেজ শাসকদের সাবধানবাণী উপে'খ'া করায় বোম্বাই শহরে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে বন্দী করা হয়। কার্শিয়াং-এ অন্তরীন করে রাখা হয়। কিছুদিন পরে তিনি মুক্ত হন। তারপরেই তাঁর ডালহৌসি ভ্রমণ। সাতমাস ছিলেন এখানে। আতিথেয়তা করেছিলেন ডক্টর ধর্মবীর।

আরেকটু এগিয়ে গেলে পড়বে জানদ্রিঘাট। প্রাক্তন চাম্বা রাজাদের প্রাসাদ ছিল এখানে। তাঁরাই লর্ড ডালহৌসিকে এই পাহাড় এলাকা লিজ দিয়েছিলেন। শিখযুদ্ধ করতে করতে রণক্লান্ত লর্ড ডালহৌসি ঘটনাচক্রে এই এলাকায় এসে পড়েন। ১৮৫০ সালে। জায়গাটির সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করে। অনতিকালের মধ্যে লিজের বন্দোবস্ত করা হয়। চার বছরের মধ্যে বৃটিশ কায়দার ঘরবাড়ি বাংলো বানানো হয়ে যায়। ভারতীয় সামন্তপ্রভুদের আট আটটি রাজ্য আত্মস্মাৎ করার জন্যে তাঁর সমালোচনা যতই হোক, এই সুন্দর শৈলশহরের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তাঁকেই মনে রাখতে হবে। ভারতের অনেক শৈলশহর দেখছি বৃটিশদের হাতে গড়া।

পঞ্জপুল্লা বা পঞ্চপুল্লা জলপ্রপাত তিন কিলোমিটার দূরে। সাতধারা রোড তথা অজিত সিং রোডের পাশে। পথের ধারে প্রাকৃতিক জলাধার। আরো পাঁচটি জলধারা চলে গিয়েছে সেতুর নিচ দিয়ে। শহীদ ভগৎ সিং-এর কাকা অজিত সিং-এর সমাধি রয়েছে এখানে। ভগৎ সিং-এর কথা আমরা জানি। লাজপত রায়ের মৃত্যুর জন্য দায়ী পুলিশ-কর্তা স্কটকে মারতে চন্দ্রশেখর-রাজগু(কে সঙ্গে নিয়ে হাজির হয়েছিলেন। ভুল করে মারলেন আরেক সাহেব স্যাণ্ডার্সকে। তারপর দিল্লীর এসেম্বলি হলে বটুকেশ্বর দত্তকে নিয়ে বোমা ফাটানো হল। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ফাঁসি হয়েছিল ভগৎ সিং-এর।

সর্দার অজিত সিং মহানায়ক সুভাষ বসু এবং কর্ণেল হবিবুর রহমানের সঙ্গে ছিলেন জার্মানিতে। স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশের প্রতি সমর্থন সংগ্রহের জন্যে। বহুদিন তাঁর দেশের বাইরে নির্বাসনে কাটে। ১৯৪৬ সালে দেশে ফেরেন। সবথেকে দুঃখজনক ঘটনা হল — আমাদের স্বাধীনতা লাভের দিনটিই হয়ে গেল তাঁর জীবনের অন্তিমদিন। যেখানে তিনি স্বাধীনতার সুসংবাদটি শুনে উৎফুল্ল হয়ে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে যান, সেখানে নির্মাণ করা হয়েছে তাঁর সমাধিসৌধ।

পঞ্জপুল্লার পথে পড়ে মিঠে জলের ঝর্ণা — সাতটি ধারায় তার পতন বলে নাম সাতধারা। সওয়া দু কিলোমিটার দূরে।

দ্রষ্টব্য আরো কিছু স্থান রয়েছে — জানদ্রিঘাট, বাকরোটা, কালাটপ। কালাটপ (২৪৫০ মিটার) প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে। দা(ণ পিকনিক স্পট। দূরের তুষারশৃঙ্গ মনোরম দৃশ্যমান হয় এখান থেকে। পথে পড়ে বড়াপাথর। সাড়ে চার কিলোমিটার দূরে গভীর

অরণ্যের মধ্যে আলাগাঁও গ্রামে আছে ভাওয়ালি মাতার মন্দির। জুলাই মাসে খুব জাঁকজমক করে পূজো হয় ভাওয়ালি মাতার।

বাকরোটা প্রায় পাঁচ কিলোমিটার। এখান থেকেও হিমালয়ের মনোরম তুষারশৃঙ্গের অপূর্ব দৃশ্য দেখা যায়। বাকরোটায় রয়েছে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি। ১৮৭৩ সালে বালক রবি পিতৃদেব দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে এখানে এসেছিলেন। স্নো-ডন বাড়িটিতে ছিলেন কিছুকাল। ডালহৌসির রূপে মুগ্ধ হয়ে 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে পরে তিনি লিখেছেন –

'বাসার নিম্নবর্তী এক অধিত্যকায় বিস্তীর্ণ কেলুবন (পাইনবন) ছিল।... বনস্পতিগুলো প্রকাণ্ড দৈত্যের মতো মস্ত মস্ত ছায়া লইয়া দাঁড়াইয়া আছে ... বনের ছায়ার মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র যেন তাহার একটা বিশেষ স্পর্শ পাইতাম। যেন সরীসৃপের গাত্রের মতো একটি ঘন শীতলতা এবং বনতলের শুষ্ক পত্ররাশির উপরে ছায়া-আলোকের পর্যায় যেন প্রকাণ্ড একটা আদিম সরীসৃপের গাত্রের বিচিত্র রেখাবলী।'

দশ কিলোমিটার দূরে ধৈনকুণ্ট শৃঙ্গ ৯০০০ ফুট উচ্চতায়। নির্মল আকাশ থাকলে এই শৃঙ্গ থেকে নাকি বিপাশা, ইরাবতী এবং চন্দ্রভাগা তিনটি নদীই দেখা যায়। ডাইনকুণ্ড নামে এক মিষ্টি জলের কুণ্ড আছে। সেই জলের রোগ নিরাময়ের আশ্চর্য 'খ'মতা আছে ! জনপ্রবাদ – শান্ত নির্জন কুণ্ডে আজো নাকি পরীর দল জলকেলি করে সেখানে।

সব না হলেও কিছু কিছু জায়গা পরে দেখা হবে ভেবে রেখেছি। তখন কে জানতো যে আমাদের ভাবনাই সার হবে। দেখা আর হয়ে উঠবে না।

পায়ে পায়ে গান্ধীচকের থেকে সুভাষচকের দিকে একটু এগিয়ে গেলাম। ডালহৌসিতে পর্যটক বড়োই কম। পথের পাশে বসার আসন খালি। বেঞ্চিতে বসা গেল মারামারি না করে। সামনে মুক্ত পৃথিবী। দৃষ্টি বাঁধা পায় না। যতদূর কেউ দেখতে চাইবে হয়তো দেখতে পাবে। বাইরে সবটা না হলেও ভিতরের সবটা তো বটেই।

শান্ত নির্জনতা ছড়ানো চারিদিকে। সবুজের মেলা। সামনের দিকে পাহাড়টি অতি দ্রুত নিচে নেমে গিয়েছে। গভীর খাদ সৃষ্টি করেছে। দূরে রূপালী নদীর রেখা দেখা যাচ্ছে। ইরাবতী? চাম্বা থেকে শুচিশুভ্র জলরাশি বয়ে নিয়ে এসেছে। তারপর আবার পাহাড় উঠে গিয়েছে অনেক উপরে। আকাশের কাছে। পিছনের পটে ঝলমল করছে তুষারধবল শৃঙ্গমালা। অনেকটা আকাশ জুড়ে। এত কাছে যেন হাত বাড়ালেই ধরা যায়। শীতার্ত আকুতি মাখা হিমেল বাতাস। পাতায় মর্মরধ্বনি। নীল আকাশ আর সাদা মেঘের পুঞ্জ মন আবিষ্ট করে রাখে। কথা বলা যায় না – ভালো লাগে নীরবে এই মধুর নির্জনতাটুকুর স্বাদ উপভোগ করতে।

ইংরেজ আমলের চারটি গীর্জা আছে। সুভাষ চকে সেন্ট ফ্রান্সিস, বালুনে সেন্ট প্যাট্রিক এবং সেন্ট অ্যান্ড্রুক চার্চ। গান্ধীচকে সেন্ট জোন্স গীর্জা। কাছেই রয়েছে জিপিও। কোলকাতায় ফোন করা হল খবরাখবরের জন্যে। একপাশে হকার্স মেলা বসেছে।

বেশির ভাগ উলের পোষাক নিয়ে। অশোক সস্তায় বেশ ভালো একজোড়া জুতো কিনল। ভারতী চেয়েছিল আমিও এমন একজোড়া ভালো জুতো কিনি। তা হেলায় অগ্রাহ্য করেছি। রোজগেরে পেশা থেকে সরে যাওয়ার জন্যে সাধারণভাবে জীবনযাপন করতে হবে বলে মনস্থ করেছি। ঠিক করেছি যে যথাসম্ভব শৌখিন বস্তু পরিহার করে চলব। ব্যবহার করব না। এখুনি সেই ভাবনা থেকে সরে আসা চলবে না।

কাছেই এক রেস্তোরায় বসে সামান্য জলযোগ সারা গেল। দিদি তেমন মজা করে খেতে পারছিল না। ঠিক হল নৈশাহার হোটেলেই সারা হবে। বললাম – জব্বর একটা ভোজ হয়ে যাক দিদি।

– হয়ে যাক। অশোক বলল।

দিদির উপর দায়িত্ব পড়ল ডিনারের মেনু ঠিক করার। রান্নায় দ্রৌপদী হলে তার উপর এমন কাজের ভার তো পড়বেই। আমাদের চেনাজানার মধ্যে পার্বতীদিই রান্নায় পুরস্কারটা পেতে পারে – এ ব্যাপারে কোন সংশয় নেই। হোটেলে ফিরে পার্বতীদিই মেনু ঠিক করে দিল।

অশোক আর আমি একপাশের ঘরে বসে টিভি দেখছি। অন্যঘরে দুই বোন বিশ্রাম নিচ্ছে। কখন দুজনেই ঘুমিয়ে পড়ল তারা জানে না। আমরাও না।

খানিক পরে পার্বতীদিদি ভারতীকে ডেকে তুলল। বলল – এই ভারতী, আমার শরীরটা ভালো ঠেকছে নারে।

– কেন, কি হয়েছে তোমার?

– ভালো লাগছে না। কেমন আনচান করছে।

– মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি, একটু ঘুমিয়ে নাও।

দিদি ঘুমিয়ে পড়ল। পাশের ঘরে আমরা তিনজনে গল্পগুজব করছি। টিভি চলছে লো ভল্যুমে। আমাদের ঘরের সামনে খানিকটা টেরেস মতো ছাদের জায়গা ছিল। ওপাশে খাদ। আরো দূরে আবার পাহাড়। আপার বাকরোটা। টেরেসে বসে থাকার ইচ্ছে ছিল খুব। সাহস হচ্ছিল না। ঠাণ্ডা না লেগে যায়।

ভারতী মাঝেমধ্যে উঠে উঠে গিয়ে দেখে আসাছে অগ্রজাকে। একবার গায়ে হাত দিয়ে দেখতে গেল – জ্বরটর হয়েছে কিনা। দেখে, শরীর বরফের মতো ঠাণ্ডা। পেশীগুলো শিথিল হয়ে পড়ছে। কেমন নেতিয়ে পড়ছে। তখুনি দিদির ঘুমের চটক ভেঙে গেল। বলল – আমার ব্যাগে সামনের চেনে সরব্রিটেট আছে, দে তো ভাও।

– এখুনি দিচ্ছি। ভারতী অশনিসঙ্কেত টের পাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি ওষুধ বার করে খাইয়ে দিল। একটু পরে দিদি আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

বাইরে এসে ভারতী জানাল – দিদি অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সরব্রিটেট খাইয়ে এসেছি। এখন ঘুমোচ্ছে।

দুশ্চিন্তা বাড়ল। এমন কিছু ব্যস্ততার মধ্যে দৌড়ঝাঁপ করিনি। কোলকাতা ছাড়ার আগে হার্ট তো তার ভালোই ছিল। তবে কি খাজিয়ার থেকে ফেরার সময় বরফের ঢালে হুল্লোড় করা বাড়াবাড়ি হয়েছিল? ভারতী বলল – বরফে হাঁটাচলার জন্যে মোজা ভিজে গিয়েছিল তো, ঠাণ্ডা লেগেছে হয়তো।

দুদিন থেকে ধরমশালা জ্বালামুখী বৈজনাথ যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল। আমাদের দিল্লি থেকে কোলকাতা ফেরার ট্রেনের টিকিট। একবার মানালী যাওয়ার চেষ্টা করা হবে কি না, তা নিয়েও কথা হচ্ছিল।

ভারতীর আবার মানালী যেতে প্রবল আপত্তি। কেননা আমরা ১৯৭৬ সালে যে অনাবিল প্রকৃতির লীলাভূমি দেখেছিলাম সেখানে, পরে অন্যদের মুখে শুনেছি সেবের বিশাল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। যা ছিল তা আর নেই। সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে। উন্নত পর্যটক কেন্দ্র গড়ার প্রয়োজনে। ও ভেবেছে – আমাদের স্বপ্নের মানালী স্বপ্নেই থাক, বর্তমানের ঝা চকচকে মানালী দেখে মোহভঙ্গ হোক এটা চাই না। তাই আর মানালী বেড়াতে যেতে চায় না।

দেখছি সব পরিকল্পনাই বানচাল হতে চলেছে।

৮।
ফেরা

সারা রাত ঘুম নেই। আধো ঘুমে আধো জাগরণে গেল। রাতে অশোকের সঙ্গে বসে ঠিক করা হল – প্রথম কথা, আর বেড়ানো নয়। ধরমশালার দিকে যাওয়ার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ বাতিল করা হচ্ছে। দ্বিতীয় কাজ হল – আগামীকাল সকালে ডাক্তার দেখিয়ে পাহাড় থেকে নিচে নেমে যেতে হবে।

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে পার্বতীদিদি একগাল হেসে জানাল – আমি এখন ভালো আছি। ধরমশালা যেতে অসুবিধা হবে না। প্রোগ্রাম বদলানোর দরকার নেই।

ভালো থাকলেই ভালো। তবে একজন ডাক্তার তো দেখাতে হবে। অনেক খুঁজেপেতে একজনকে পাওয়া গেল। উনি এসেই বললেন – যত তাড়াতাড়ি পারেন পেশেন্টকে পাঠানকোট নিয়ে যান। সম্ভব হলে পাঠানকোটে আরেকজন ডাক্তার দেখাতে পারেন বা দিল্লি নিয়ে যেতে পারেন। ভালো থাকলে কোলকাতা। তবে সাবধানে নিয়ে যাবেন। বেশি ধকল না হয়।

জিনিসপত্র মোটামুটি গোছানোই হয়ে গিয়েছিল। হোটেল বিল মিটিয়ে ট্যাক্সি করে পাঠানকোট যাত্রা করা হল। আশি কিলোমিটার পথ। ড্রাইভারকে বলা হয়েছিল – হার্টের পেশেন্ট আছে। গাড়ি খুব আস্তে চালাতে হবে। জোরে টার্নিং নেবেন না যেন।

গাড়ি ধীরেসুস্থে চালিয়ে নিয়ে এসেছে। দিদির কোন কষ্ট হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। ফেরার পথটা ভারী সুন্দর ছিল। অবশ্য সেদিকে মন দেওয়ার কোন উপায় ছিল না। আড়াই ঘন্টার পথ শুধু শঙ্কায় কেটে যায়।

পাঠানকোট স্টেশনে পৌঁছেছি। ওয়েটিং(মে একখানা লম্বা কেদারা পাওয়া গেল। সেখানে পার্বতীদিকে শুইয়ে রাখা হল। দিদি মনে হচ্ছে ঠিকই আছে।

স্টেশন চত্বরের বাইরে এসে ফেরার ব্যবস্থা করতে খোঁজখবর নিচ্ছি। পাঠানকোট থেকে ছোট গাড়ি যাচ্ছে যোগীন্দরনগর। যথেষ্ট যাত্রী বোঝাই করে। এ গাড়ি কাংড়া-জ্বালামুখী হয়ে যাবে। জ্বালামুখী সতীর একান্ন পীঠের এক পীঠ। দিদি জামাইবাবুর সঙ্গে আগেই জ্বালামুখী দেখে নিয়েছে। লেলিহান অগ্নিশিখা অনির্বাণ জ্বলছে। সতীর জিহ্বা পড়েছিল নাকি এখানে। আসলে বোধ হয় কোন ফাটল থেকে বেড়িয়ে আসছে প্রাকৃতিক জ্বালানি গ্যাস। কাংড়া থেকে ধরমশালা যাওয়া যায়। চলার পথে দেখা সম্ভব পালামপুর এবং বৈজনাথ মন্দির।

সেবার মানালী থেকে কাশ্মীর যাওয়ার পথে বৈজনাথ মন্দিরে গাড়ি দাঁড়িয়েছিল বলে আমাদের মন্দির দর্শন সম্ভব হয়েছিল এক লহমার জন্যে।

ভারতীকে বললাম – মনে আছে সেবার মানালী থেকে পাঠানকোট এসে স্টেশনের বাইরের পাঞ্জাবী হোটেলে কি জব্বর মাংস-(টি খাওয়া হয়েছিল।

– মনে নেই আবার। খুব মনে আছে।

স্টেশন মাস্টারকে ধরে অন্তত দুখানা এসি টিকিট ম্যানেজ করতে চেষ্টা করছিলাম। এসি টিকিট না পেলে দিদিকে নিয়ে যাওয়া দুষ্কর। তাহলে দিল্লি চলে যাব। ওখানে ভারতীর খুড়তুতো বোন লালি ও সুপ্রিয় রয়েছে। স্টেশনমাস্টার আশ্বাস দিলেন – টিকিটের ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

তার চেষ্টায় জম্মুতাওয়াই-শিয়ালদহ ট্রেনে চড়ে বসলাম। মোটা টাকা গচ্চা দিতে হল সেজন্যে। পরে ভেবে দেখেছি – টিকিটের জন্যে তাকে ঘুষ দেওয়ার কোন দরকার ছিল না। আসলে আশঙ্কায় দুর্ভাবনায় কোন রিস্ক নিতে সাহস পাইনি।

ট্রেনে বসে দুর্গা দুর্গা জপ করতে করতে ফিরে চলা। কোলকাতায় খবর পাঠানো হয়েছে। পথে আর কোন বিপত্তি হয়নি সেটাই রক্ষে'।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ শিয়ালদহ পৌঁছেছি। দীপিকা-চিন্ময় অমিয়-কুমকুম জয়ন্ত-শর্মিলা সবাই এসেছে স্টেশনে। প্রবল উদ্বেগ নিয়ে অপে'খ'া করছে তাদের মাতৃদেবীর জন্যে। মা যে শেষ অবধি নিজের পায়ে গাড়ি থেকে নামতে পারবে এবং হেঁটে স্টেশন চত্বর পার হয়ে গাড়িতে উঠে বসতে পারবে এতটা বোধ হয় আশাই করেনি। আমরাও ভাবিনি।

এদিকে ডাক্ত ারবদ্যি নার্সিংহোম সব ঠিক করে রাখা হয়েছে। স্টেশন থেকে গাড়িতে তুলে নিয়ে সোজা নার্সিংহোম। একেবারে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ভর্তি করে দেওয়া হল।

বাইরে দুরু দরু বুকে অপে'খ'া করছি আমরা সবাই। ডাক্তারবাবু প্রাথমিক পেশেন্ট পরী'খ'া করে কি বলেন শুনতে হবে! মনে মনে ভাবছি, দিদিকে নিয়ে না বেরোলেই হত। ভালোমন্দ কিছু হয়ে গেলে বড়োই অনুশোচনায় পড়তে হবে। ছেলেমেয়েরা হয়তো কিছু বলবে না। ভাববে যার যা কপালে ছিল তাই হবে। অন্যরা এত সহজে ছাড়বে না। তারা বলবেই — এমনভাবে অসুস্থ মানুষটাকে নিয়ে বেরোনো অনুচিত হয়েছে। বিশেষ করে ভারতীকে সেকথা শুনতে হত।

একটু পরে ডাক্তারবাবু নিচে নেমে এসে বললেন — খুব সিরিয়াস কন্ডিশন। পেশেন্টকে তো প্রায় শেষ করেই এনেছেন।

মনটা আরো খারাপ হয়ে গেল। পেশেন্ট তো পায়ে হেঁটে শিয়ালদহ থেকে গাড়িতে উঠল। মনে তো হল না শেষ হওয়ার মতো পরিস্থিতি। হতে পারে ভিতরে ভিতরে কাহিল হয়েছে। বাইরে থেকে বোঝার নয়। কি করব! শেষ করার কোন ইচ্ছাই তো ছিল না।

তারপর কদিন ধরে হুলুস্থুলু কাণ্ড চলল। সেসব আরেক গল্পের বিষয়। ডাক্তারবদ্যি করে হার্ট সার্জারি প্রায় করতে করতে অপারেশন টেবিল পর্যন্ত গিয়ে এবং শেষ পর্যন্ত তা না করে পার্বতীদি বাড়ি ফিরে গেল। এখন একরকম ভালোই আছেন। বোধ হয় মাতা বৈষে(াদেবীর কৃপায়। অন্তত আমরা ভারমুক্ত হলাম।

মাঝখান থেকে আমাদের ধরমশালা বেড়ানোটা এবারেও মাঠে মারা গেল। দেখতে পাচ্ছি ওখানে কয়েকবার চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়ে উঠছে না। কবে যে পথের বাঁশী টেনে নিয়ে যাবে আমাদের ওপথে কে জানে!

জম্মু-পহেলগাঁও- বৈষ্ণোদেবী-ডালহৌসি-চাম্বার মানচিত্র

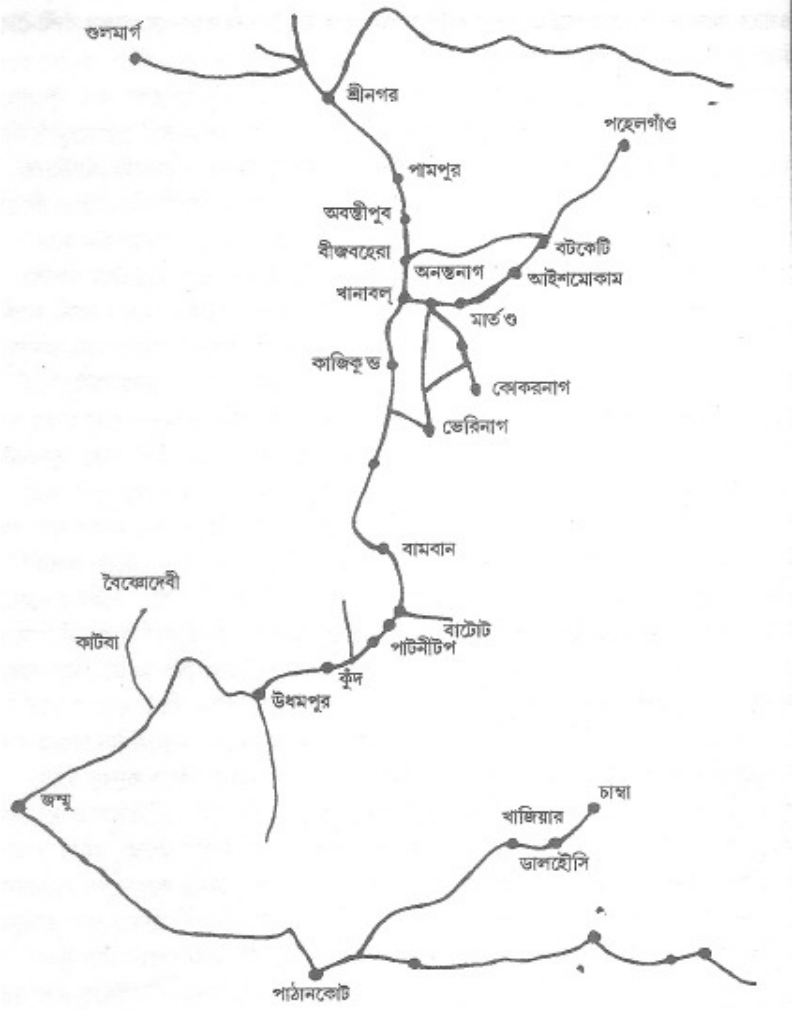

অমরনাথ দর্শন

১।পূর্বকথা

ছ' বছর পরের কথা। আমেরিকা থেকে হঠাৎ করে ইস্কনের প্রবল কৃষ(ভক্ত ছুটু, ভক্তনাম শুভব্রত দাস, এসে হাজির পিসিমণির সঙ্গে দেখা করতে। পিসেমশায়ের সঙ্গে ও ওর এক পরিচিত ব্যক্তির পুরোনো বাড়ি সারানো নিয়ে কিছু আলোচ্য ছিল। বিছানায় শুয়ে হাতপা ছড়িয়ে ছোটবেলার মতো গল্প করতে করতে বলল — পিসিমণি শুনেছেন তো তাপি-প্রিয়দা এবার অমরনাথ যাচ্ছে।

— অমরনাথ? মানে কাশ্মীরের অমরনাথ?

— হ্যাঁ। সেই দুর্গম অমরনাথ। আপনারা নিশ্চয়ই দেখেছেন?

— না না আমাদের যাওয়া হয়নি। অনেকবার পরিকল্পনা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সে সব বানচাল হয়ে গিয়েছে।

— সত্যি ডাক না এলে যাওয়া হয় না। এবার চলে যেতে পারেন তো ওদের সঙ্গে।

আমরা ভ্রমণপিয়াসী। মধ্যবিত্ত হয়েও এই বিলাসিতাটুকু ত্যাগ করতে পারিনি। খেয়ে না-খেয়ে যে ভাবে হোক বেড়ানো চাই। নানা দেশে নানা মানুষের মধ্যে প্রকৃতির নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে বিচরণ করতে পা বাড়িয়েই আছি। এ ব্যাপারে আমরা কর্তা-গিন্নি সমমেরু।

ছুটুর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই আমাদের অমরনাথ দর্শনের সুপ্ত বাসনা জেগে উঠল। অনেকদিন আগে একবার অমরনাথ যাত্রার আয়োজন হয়েছিল এবং সব কিছু ঠিকঠাক করেও সে যাত্রা বাতিল করতে হয়েছিল বড়োজামাইবাবু শ্রীরামপুরের মদনদাদার জন্যে। বিশাল চেহারা হলে কি হবে তাঁর হৃদয় সম্প্রতি কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। হৃদয়-ঘটিত সমস্যার কারণে কন্যা দীপিকা কানে স্টেথো লাগিয়ে গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে প্রবল আপত্তি জানিয়ে বলেছিল — অমরনাথ? বাবার যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

মেয়ের দাবীর কাছে প্রতিরোধ গড়ার 'খ'মতা স্নেহার্দ্র পিতা হারিয়ে বসেছে অনেককাল। পত্রপাঠ সে আয়োজন বাতিল করতে হয়। তখন কাশ্মীরে এমন জঙ্গীপনা ছিল না। এত উদ্যোগ আয়োজন ছিল না। তবু দুর্গম পথে আমরা দুজনে চলতে ভরসা পাচ্ছিলাম না। আমাদের 'খ'ুদ্র হৃদয় এ ব্যাপারে বড়োই দুর্বল।

তারপরে আরো দুবার চেষ্টা করেছি এবং ব্যর্থ হয়েছি। ছুটুর ভাষায় বাবা অমরনাথের ডাক আসেনি। আমাদের ভাষায় চেষ্টা জোরালো ছিল না। ততদিনে বয়স বেড়েছে। শারীরিক সামর্থ্য এবং সাহস কমেছে। আর্থিক অবস্থাও নিম্নগতি — নিজেরাই নিজেদের জন্যে তা নির্বাচন করেছি। সব মিলিয়ে মনে মনে ধরে নিয়েছি যে অমরনাথ যাত্রার বয়সটা আমরা ইতিমধ্যে পেরিয়ে এসেছি। কেদার-বদরী যে সেরে ফেলেছি এই ঢের। হঠাৎ করে ছোট ভায়রা অশোকের উদ্যমে বৈষে(াদেবীও দর্শন করা হল কয়েক বছর আগে। দুর্গম পথে চলার এখানেই ইতি। সুতরাং বাবা অমরনাথ সুদূর কাশ্মীরের দুর্গম গুহায় আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে অধরা থেকে যাবেন। জগতে সবই পাওয়া যায় না। সবার সব জোটে না। তা সহজে মেনে নেওয়ার মানসিকতা আমরা এতদিনে অর্জন করে ফেলেছি।

শ্রীমান অশোক দত্ত আরেক ভ্রমণ পাগল মানুষ। গত বছরে ধা করে অমরনাথ চলে গেল কাশ্মীরের জঙ্গীহানার তোয়াক্কা না করে। একদল বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে। ও ওই রকম। দুমদাম হঠাৎ ভালো লাগছে না বলে বেড়িয়ে পড়তে পারে। সঙ্গীসাথীও জুটে যায়।

সেবারে পহেলগাঁওতে একেবারে যাত্রীক্যাম্পের ওপর জঙ্গী হামলা হয়েছিল। ২রা আগস্ট, ২০০০ সালে। হঠাৎ আক্রমণে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে সিআরপিএফ ঠিকমতো ল'খ'্য স্থির রাখতে পারেনি। এলোপাথারি গুলি ছুঁড়েছিল। ফলে জঙ্গীর বদলে অনেক সাধারণ মানুষ হতাহত হয়েছিল সেই সংঘর্ষে। বোধ হয় জনা পঁয়ত্রিশ লোক মারা যায়। তার মধ্যে একুশজনই ছিল অমরনাথ তীর্থযাত্রী। বেসরকারী মতে মৃতের সংখ্যা সত্তর-আশিজন। অশোকরা পহেলগাঁও পৌঁছেছিল সংঘর্ষের দুদিন পরে। তখনও ওরা দেখতে পেয়েছিল চারদিকে ছড়ানো মৃত্যুর সা'খ'র।

অমরনাথ দর্শনে অবশ্য ওদের কোন সমস্যা হয়নি। যথারীতি গুহায় তুষারলিঙ্গ দর্শন করতে পেরেছিল। আমরা সংবাদপত্র মারফত জেনেছি পহেলগাঁও যাত্রীক্যাম্পের উপর আক্রমণের ঘটনা। খুব দুশ্চিন্তা গিয়েছে তখন আমাদের সকলের। ঘটনা ঘটার দুদিন পরে অশোক ফোনে বাড়িতে খবর পাঠিয়েছিল যে ওরা সকলে ঠিকঠাক আছে। ভয়ের কিছু নেই — পরিকল্পনা মতো বেড়িয়ে ফিরবে।

অমরনাথ থেকে সেবার ওরা বালতাল-সোনমার্গ হয়ে শ্রীনগর গিয়েছিল। পকেটে টানাটানি থাকলেও আসলে শ্রীনগর দেখার লোভ সামলাতে পারেনি। শ্রীনগরে ডাল হ্রদের ধারে ওরা যখন ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তখন অদূরে এক হোটেলের সামনে ভয়ানক বিস্ফোরণ হয়। একটু আগে ওরা ওই হোটেলের পাশ দিয়েই ঘুরে এসেছে। আর ঠিক তারপরেই বোমা বিস্ফোরণ। একেবার চোখের সামনে ঘটা এরকম ঘটনায় সকলেই ঘাবড়ে যায়। ওরা যে ওখানে গিয়েছিল সে খবর আমরা কোলকাতাবাসীরা জানি না। অশোকের স্ত্রী-পুত্রও জানত না মনে হয়।

শ্রীনগর থেকে ওরা আবার পহেলগাঁও ফিরে আসে। ওখানে জমা করে যাওয়া মালপত্র ফেরত নেওয়ার জন্যে। তারপর কোলকাতা ফেরার রাস্তা ধরে।

এত সব বিস্ফোরণমূলক ঘটনার পরেও ফিরে এসে অকুতোভয় অশোক। উৎসাহের সঙ্গে আমাদের বলল — কোন ভয় নেই মেজদি। দিব্যি ঘুরে আসতে পারেন আপনারা। যথেষ্ট মিলিটারি প্রটেকশন দিয়ে ওরা তীর্থযাত্রীদের নিয়ে যায়। এরকম দুএকটা ঘটনায় ঘাবড়ানোর দরকার নেই। সবথেকে সুন্দর দেখার জিনিস কি জানেন? চলার পথে তীর্থযাত্রীদের নানা সেবাসমিতি যেভাবে আদর-আপ্যায়ন করে তা একেবারে অবিশ্বাস্য। না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না। আমি বলছি আপনারা একবার ঘুরে আসতে পারেন। ভয়ের কিছু নেই, আপনারা পারবেন।

বেড়াতে পারলে আমরা আর কিছুই চাই না। আমরা 'ঋণং কৃত্বা' ঘৃত খাওয়ার জন্য উৎসুক নই। তবে বেড়ানোর সুযোগ পেলে তা সহজে নাও ছাড়তে পারি। বাঙালি হুজুগপ্রিয় বদনাম আছে। আমরা সেভাবে নিজেদের হুজুগে বলতে চাই না। তবে ভ্রমণবিলাসী। ওই একটাই খরুচে রোগ আছে যেটা ছাড়ানো গেল না এত বছরেও।

সেদিনটা ছিল শনিবার। মানস চৌধুরির বাড়িতে লোকনাথবাবার তিরোধান উৎসব ছিল। ওর ভাই নাদু ভয়ানক রকমের লোকনাথবাবার ভক্ত। তারই উৎসাহে এবং অর্থানুকূল্যে উৎসব হয় প্রতি বছর। আমাদের নিমন্ত্রণ ভোগপ্রসাদের।

সকালবেলা প্রিয় ফোন করেছিল আমাদের কাছে। করেছিল ছুটুর খোঁজখবর করতে। সেই সুযোগে ওকে পাকড়াও করা হল — কি বাবা প্রিয়, তোমরা অমরনাথ যাচ্ছ নাকি! আমাদের নিয়ে যাবে না?

— পিসিমণি আপনারা যাবেন তা তো জানি না। সত্যিই যাবেন?

— নিয়ে গেলে যাই।

— সত্যি যাবেন? তাহলে এক ঘন্টার মধ্যে মনস্থির করে আমাকে ফোন করুন। আমরা বড়ো একটা দল যাচ্ছি, বুঝেছেন তো। কোলকাতার নামীদামী হোমরাচোমরা সব যাচ্ছে। তাদের মিসেসদের নিয়ে। কোলকাতা পুলিশের হেভিওয়েট লোকজন। সবই আমার চেনাজানা। চারপাঁচজন ডাক্তারবদ্যি পুলিশ অফিসার বিরাট দল। খুব ভালো স্পেশাল ব্যবস্থাদি করা হচ্ছে। বুঝেছেন? কোন অসুবিধে হবে না। যাবেন তো চলুন।

একঘন্টা মাত্র সময়। এর মধ্যে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা অমরনাথ যাব কি না? কাশ্মীরের প্রচণ্ড ডামাডোলের মধ্যেও অশোকের বেড়িয়ে আসার পর ভয়টা কেটে গিয়েছে। উৎসাহটা চাগিয়ে উঠেছিল তো বটেই। ছুটুর দৌত্যপনায় মনে হল চেনাজানা এমন একদল ডাক্তারের হেফাজতে থেকে ওই দুর্গম পথে যেতে পারলেই সবথেকে ভালো হয়।

রাজনৈতিক আবহাওয়াও এখন বেশ ভালো। কয়েকটি জঙ্গী সংগঠন কিছুদিনের জন্যে তাদের কার্যকলাপ স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করেছে। বোঝা যাচ্ছিল এটাই একমাত্র সুযোগ। বলা উচিৎ আমাদের জীবনের শেষ সুযোগ। বাবা অমরনাথ এবার ডাক দিয়েছেন মনে হচ্ছে।

মামণির অনুমতি ব্যতীত এক পা চলার উপায় নেই ভারতীর। অর্থাৎ আমারও। মামণি মানে ডাক্তার দীপিকা হালদার — পার্বতীদিদির কন্যা। তাকে ফোন করা হল। আশ্চর্যের কথা এবার মেয়ে একবাক্যে রাজী হয়ে গেল। বলল — বাবার সঙ্গে সেবার তোমাদের যাওয়া আটকে দিয়েছিলাম ভয়ে ভয়ে। তাই ভাবলাম, না এবার তোমরা যাও। মনোবাসনা অপূর্ণ রাখার দরকার নেই। যা হবার তা তো হবে।

আরো একজনের সম্মতি আদায় করতে হবে। তা ভ্রাতুষ্পুত্র সন্দীপ্তর। আসলে তাকে বাদ দিয়ে যেতে হবে এবারে। ঐ দুর্গম পথে ওকে নিয়ে চলা সম্ভব নয়। সন্দীপ্ত যথারীতি যাব বলে বায়না ধরেছিল। দিনকয়েক আগে ও নৈনিতাল-কৌশানি ঘুরে এসেছে ওর মা-বাবার সঙ্গে। সেকথা ওকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে পরিষ্কার ভাষায় বলা হল — ওখানে রিস্কের মধ্যে কিছুতেই তোমাকে নিয়ে যাব না। আমাদের বয়স হয়েছে। দুর্ঘটনা ঘটলে ঘটবে। তোমাকে নিয়ে যাব না কিছুতেই।

ভারতীর অফিসে তখন মহা দুর্যোগ চলছে। বৃদ্ধ বয়সে ওর পদোন্নতি হওয়া নাকি নিতান্ত বাঞ্ছনীয় এমন একটা বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে কর্তৃপক্ষের। সেজন্যে অবসরের আগে মাস কয়েকের জন্যে হলেও ওর পদোন্নতি চাই এবং তার জন্যে পাটনা যেতে হবে। আসল কথা সম্প্রতি ওদের কিছু আর্থিক সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় পদোন্নতি বর্জন করলে প্রাপ্ত আর্থিক সুবিধাদি সব বরবাদ হয়ে যাবে। অবশ্য কিছু ডিগ্রিধারী কর্তাদের ঈর্ষায় তাও শেষ পর্যন্ত পাওয়া যাবে কি না বোঝা যাচ্ছিল না। যাই হোক পাটনা যাওয়ার ঝামেলা ছিল। তার মধ্যে অমরনাথ পর্ব। ঠিক হল, যদি পাটনা যেতে হয় অমরনাথ ঘুরে এসে তবেই যাওয়া যাবে।

এদিকে হাতে তেমন টাকাপয়সা নেই। তা নিয়ে অবশ্য বেশি ভাবি না। অভাব হলে ধারের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। সেই ভরসায় এক ঘন্টা পরে প্রিয়কে বলা হল — এমন সুযোগ হাতছাড়া করছি না। আমরা তোমাদের সঙ্গে যাব।

— তাহলে চলে আসুন সাড়ে তিনটে নাগাদ স্ট্র্যান্ড রোডে এই ঠিকানায়। বলে প্রিয় ঠিকানা দিল।

লোকনাথ বাবার প্রসাদ গ্রহণ করে প্রিয়র সঙ্গে গেলাম স্ট্রাণ্ড রোডে জনৈকপর্যটকের অফিসে। তাদের সঙ্গেই প্রিয় বিশেষ ব্যবস্থা করেছে আমাদের সফরসূচীর। আমরা সাধারণত নিজেরাই বেড়াই। পর্যটক সংস্থার সঙ্গে যাই না। এক্ষেত্রে তার ব্যত্যয় মেনে নিতে হল। প্রিয় বলল — মোট দশদিন এগারো রাতের সফর। দুদিন দুরাত করে চারদিন ও চাররাত যাতায়াতেই চলে যাবে। একদিন যাবে জম্মু থেকে পহেলগাঁও যেতে। পাঁচদিন রাখা

হয়েছে পহেলগাঁও থেকে অমরনাথ যাওয়া-আসার। আমরা চেষ্টা করব তা চারদিনে সেরে ফেলতে। তাহলে একদিন পহেলগাঁওতে নেমে বিশ্রাম করা যাবে।

হিসেব কষে দেখা যাচ্ছে ২৯শে জুন হাওড়া থেকে যাত্রা করলে জম্মু পৌঁছব ১লা জুলাই। পরদিন বাসে করে পহেলগাঁও। ৩রা জুলাই হেঁটে বা ঘোড়ায় অমরনাথ যাত্রা। প্রথম রাত কাটাতে হবে শেষনাগ, দ্বিতীয় রাত পঞ্চতরণী। পরদিন ৫ই জুলাই গুহা দর্শন করে আবার পঞ্চতরণীতে ফিরে আসা এবং ওখানে রাত্রিবাস। পরদিন ৬ই জুলাই একেবারে পহেলগাঁও নেমে আসব। ৭-তারিখ পহেলগাঁও দেখে পরদিন জম্মু ফিরে আসা। ঐদিনই ফেরার ট্রেন ধরব। কোলকাতা পৌঁছব ১০ই জুলাই।

পর্যটকের অফিসে অগ্রিম তিন হাজার টাকা জমা করে আমাদের যাত্রা নিশ্চিত করা হল। বাকী দশ হাজার টাকা সাতদিনের মধ্যে দিয়ে দেব অঙ্গীকার করে একখানা সফরসূচী হাতে পেলাম।

অমরনাথ যাব বললেই আজকাল যাওয়া যায় না। সরকারি সম্মতি প্রয়োজন। যাত্রীদের নাম রেজিস্ট্রি করতে হবে। যাত্রার অনুমতির জন্যে আবেদন করতে হবে জম্মু-কাশ্মীর পর্যটন বিভাগে। পাসপোর্ট সাইজ ফটো দিতে হবে সঙ্গে। রাজনীতির জটিল আবর্তে ভারত ভাগের পর কাশ্মীরভূখন্ড স্বদেশ না বিদেশ, সন্দেহ হয়। ডাক্তারী পরী'খ'া করতে হবে অবশ্য আপন সুর'খ'ার জন্যে। নিঃসন্দেহ হতে হবে পাহাড়ী এলাকায় অতটা উঁচুতে চলাফেরা করতে হার্টের কোন সমস্যা দেখা দেবে কি না। তার জন্যে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে হবে।

আমাদের বড়ো সমস্যা টাকাপয়সার ব্যবস্থা করা। ঐ সময় বাড়ির কাছের একটি ব্যাঙ্কে লকার পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে বলে সেখানে কিছু টাকা দীর্ঘমেয়াদে জমা করতে হবে। লকার-লাভের সেটাই শর্ত।

ভাবছি কার কার কাছে হাত পাতা যায়? সর্বাগ্রে মামণি। ভারতীর খুড়তুতো বোন মুন্নার কাছেও চাওয়া যায় অল্পসল্প। আমার পুরোনো বন্ধু হরিদাস রায়ের কাছ থেকে আপাতত কিছু টাকা পাওয়া সম্ভব। সকলের থেকে কিছু কিছু করে ধার নিয়ে লকার এবং বেড়ানোর ব্যবস্থা হয়ে যাবে মনে হল। এবং তাই হল।

মুন্নার বর স্বপন সাধুখাঁকে বলা হল — মুন্না তো যেতে পারবে না। স্কুল আছে। তুমি যাবে নাকি স্বপন? টিকিট ফেরত যাচ্ছে গোটাকয়েক। যাবে তো চল।

স্বপন রাজি হল না যেতে। কতটা কাশ্মীরের ঝামেলার জন্যে ভয় পেয়ে আর কতটা মুন্নার বিরহে জানি না।

আরেকদিন পর্যটক অফিসে গিয়ে নাম রেজিস্ট্রেশনের জন্যে ছবি এবং ডাক্তারের শংসাপত্র দিয়ে এলাম। সকলে থ্রি-টায়ার বাতানুকূল যানে ভ্রমণ করছে। দুটো টিকিটের জন্য খরচ ২৩৫৪ টাকা। এত দেরীতে তার টিকিট পাওয়া ভয়ানক সমস্যা। ছুট্টু, অশোক এবং প্রিয় তিনজনেই আশ্বস্ত করল ব্যবস্থা করে দেবে। তিনজনকেই ব্যবস্থা করার সুযোগ অর্পণ করা গেল। অবশেষে যাওয়ার সময়কার টিকিট পাওয়া গেল বটে কিন্তু ফেরার

টিকিট ওয়েটিংলিস্টে। স্লিপার ক্লাসের দুটো টিকিট অবশ্য পেয়েছি ৮৩৪ টাকায়। থ্রিটায়ার টিকিট কনফার্মড হলে স্লিপার টিকিট রিটার্ন করে দেব।

অমরনাথ যাত্রার জন্যে পোষাক পরিচ্ছদ জোগাড় করতে হবে। কারো কাছ থেকে টুপি, কারো কাছ থেকে দস্তানা, কারো কাছে ড্রয়ার-ব্যাগ-গরমজামা সংগ্রহ করা হল। জুতোটা ওভাবে ম্যানেজ হয় না। সেটা কিনতে হল।

ওষুধপত্র মামণি দিয়ে গেল। হাইট সিকনেসের জন্যে বিশেষ করে কর্পূর নিতে হবে। যাদব মল্লিকের প্রেসক্রিপশন মতো হোমিওপ্যাথি ওষুধ কোকা-৩০ এক শিশি। প্রচুর কাজু-কিসমিস-কাঠবাদাম টুকরো করে কেটে ছোট ছোট প্যাকেটে ভরে নেওয়া হল। শ্রীরামপুর থেকে অমিয় এক পেটি মিনারেল ওয়াটার দিয়ে গেল।

অমরনাথ মানে সাজসাজ ব্যাপারই বটে। অবশেষে একদিন রাতের ভোজনপর্ব সাঙ্গ করে বাক্সপেটরা নিয়ে ট্যাক্সি করে রবীন্দ্র সেতু পার হয়ে গুটিগুটি হাওড়া স্টেশনে হাজির হলাম।

জয় বাবা অমর নাথ।

২। ট্রেনযাত্রা

২৯শে জুন শুক্রবার ২০০১ সাল। রাত এগারোটায় ৩০৭৩ আপ হাওড়া জম্মু-তাওয়াই হিমগিরি এক্সপ্রেস যথাসময়ে যাত্রা শু(করল। সকলে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল — জয় বাবা অমরনাথ। বোম ভোলে, বোম বোম ভোলে।

ভোলানাথের দর্শনে যাচ্ছি। তাঁর জয়ধ্বনি দিয়ে যাত্রার শুভ সূচনা হল। শ্রীঅমরনাথের সঙ্গে আমাদের অন্তত আর একজনকে স্মরণ করা উচিৎ। সে হল সালকিয়ার জনপ্রিয় ডাক্তার প্রিয়রঞ্জন ঘোষ। শেষ পর্যন্ত যে আমাদের অমরনাথ যাত্রা সম্ভব হচ্ছে তার জন্যে অকুণ্ঠ সাধুবাদ প্রাপ্য প্রিয়রঞ্জনের।

দেখা গেল, শুধু আমাদের নয়, অনেকের ে'খ'ত্রে সেই মূল উদ্যোক্তা। যদিও আমরা কোন এক পর্যটক সংস্থার তদারকিতে যাচ্ছি, তবে সেই সংস্থাও ডাক্তারবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। প্রিয়কে দেখে অধিকাংশ যাত্রীর সমাগম হয়েছে। সকলের মধ্যে কার্যকরী যোগসূত্র হল প্রিয়। বেশ কয়েকজন কর্তাব্যক্তি তাদের ধর্মপত্নীদের ওরই হেফাজতে অর্পণ করে গিয়েছেন। সকলের কাছে প্রিয় সুপরিচিত ডাক্তারবাবু বলে। সঙ্গে যাচ্ছে দেবযানি মানে আমাদের তাপি। ভারতীর ভাইঝি। তাপির বাবা-কাকারা আত্মীয় না হয়েও আত্মীয়ের থেকে অনেক বেশি। অনাত্মীয় বোধটাই ধুয়েমুছে গিয়েছে দুপ'খ'ের মন থেকে। আমরা বলি, সম্পর্ক নির্মাণের এ হল মানবিক দলিল।

স্টেশনে পরিচয় হল পর্যটক সংস্থার মুখ্য ব্যবস্থাপক মিলন মুখার্জির সঙ্গে। হাওড়ার ছেলে। ওর সহচর অন্যান্যরা রান্নার সরঞ্জামাদি নিয়ে অন্য কামরায় যাচ্ছে। ইত্যাবসরে আমাদের দলের সদস্যদের পরিচয় দিয়ে রাখি।

প্রিয়র বোন সাধনাকে অবশ্য আগে থেকেই চিনতাম। হাওড়াতেই বাড়ি। ওর বর অলোক রঞ্জন বসু ব্যস্ত উকিলমানুষ – মানুষের অর্থোপার্জনের নানা ঝক্কি সামলায়। হালে পা ভেঙে বাড়িতে বসে আছে। পাহাড়ে যেতে অপারগ। তবু গিন্নিকে পুণ্য সঞ্চয়ে পাঠিয়ে বাড়িতে বসে তার ভাগ নেবে। ওকালতি বুদ্ধি বটে!

কবিতা মুখার্জির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল একদিন পর্যটকের অফিসে বসে। অনর্গল কথা বলতে পারে বটে মেয়েটি। খই ফোটানো আর কাকে বলে! কবিতার বরের সঙ্গেই প্রিয়র বন্ধুত্ব। নাম রবীন মুখার্জি। কার্ডবোর্ডের ব্যবসা তার। বন্ধুত্ব কিভাবে হয়েছিল জানিনা। খুব হুল্লোড়বাজ লোক নাকি সে। হাত ভেঙেছে তারও। না-যাওয়ার অজুহাত কি না কে জানে! কর্তাও স্টেশনে এসেছিল কবিতাকে বিদায় জানাতে।

হাওড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে আমাদের পরিচয় হল অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে। কবিতার বড়ো বোন অনীতা যাচ্ছে। অনীতা মুখার্জির নিবাস বিবেকানন্দ রোডে। কর্তার নাম কল্যাণ মুখার্জি। বড়বাজারে লোহালক্কড়ের ব্যবসাপত্র আছে। পৈতৃক বিবেকানন্দ রোডের বাড়িতে আছে প্যাথলজিকাল ল্যাবরেটরি। অনীতা-কবিতার সঙ্গে এসেছে কবিতার আত্মীয়া, বিপাশা দেবী।

কালিঘাট থেকে এসেছে রুমা মিত্র। মুর্শিদাবাদের মেয়ে। কর্তা পার্থসারথি মিত্র মেরিন ইঞ্জিনিয়ার। সমুদ্রভেলায় দেশদেশান্তরে গমন করেন। গিন্নিকে দুর্গম পথে একাই ছাড়তে হচ্ছে। রুমা বাড়িতে রেখে এসেছে দুই ছেলেমেয়ে। হাওড়া স্টেশনে প্রিয় সদর্পে ঘোষণা করল – মিস্টার মিত্র সুন্দরী স্ত্রীরত্নটিকে আর কারো সঙ্গে ভরসা করে ছাড়বেন না, আমার সঙ্গে ছাড়া, বুঝেছেন তো।

মনে মনে বললাম – বুঝেছি, কারণ না বুঝিয়ে তুমি ছাড়বে না।

যাদবপুর থেকে এসেছে শাশ্বতী বিশ্বাস। সঙ্গে ওর মা রঞ্জিতা বিশ্বাস এবং কাকিমা সবিতা সাহাকে নিয়ে। দুই মহিলাকে নিয়ে কমবয়েসী মেয়েটি কী দুঃসাহসে ভর করে দুর্গম অমরনাথ যাত্রায় বেড়িয়ে পড়েছে! বোঝা যায় বয়স কম হলেও গুরুদায়িত্ব বহন করতে স'খ'ম। শাশ্বতী ইনকাম ট্যাক্স প্রাক্টিস করে বেশ গৌরবের সঙ্গে। কুম্ভমেলায় গিয়ে অনীতা-কবিতার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ওর। শাশ্বতীর মা আগে শি'খ'কতা করতেন। এখন করেন না। বর্তমানে নানা প্রকার এজেন্সির সঙ্গে জড়িত। কোলকাতার অভিজাত মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারক রাধা সুইটস। সেটা শাশ্বতীর কাকিমা সবিতাদের। কোলকাতার অন্যতম প্রতিষ্ঠান মডার্ন ডেকরেটর্সও নাকি ওনাদের পারিবারিক ব্যবসা।

দ'খি'ণেশ্বর থেকে এসেছে তাপস ঘটক। গিন্নি মিতালীকে নিয়ে। লোকনাথবাবার নিষ্ঠাবান সেবক তারা। ঘটকবাবু একজন চাকুরিজীবী এবং ভ্রমণবিলাসী। মিতালী ঘরকন্না নিয়ে আছে। সকলেই ধনাঢ্য পরিবার মনে হচ্ছে। আমরাই হংসমধ্যে বকো যথা।

আমাদের বাতানুকুল কামরায় জড়ো হল সাধনা-রুমা-অনীতা-কবিতা, অনীতার আত্মীয়া, শাশ্বতী ও তার মা, সবিতা, তাপস ঘটক এবং মিতালী ঘটক। গুনে দেখি চৌদ্দজন। বললাম – তবে যে প্রিয় বলেছিল তিরিশ-চল্লিশ জনের দল।

– ধরো ওকে। ভারতী বলল।

জিজ্ঞাসা করলাম প্রিয়কে – চল্লিশ জনের দল যাচ্ছে বলেছিলে, কোথায় তারা?

– এই তো এখানে দেখুন না এখানে রয়েছে কতজন। কয়েকজন রয়েছে অন্য কামরায় স্লিপার কোচে। যাওয়া ক্যানসেল করল কয়েকজন।

মিলন মুখার্জীও বলল – হ্যাঁ, অন্য কামরায় কয়েকজন রয়েছে তো।

পরে ট্রেনে বসে আলাপ হল বেহালা থেকে আসা শ্রীমতী শীলা ঘোষ এবং শ্রীমতী রিনা সরকারের সঙ্গে। ওনারা দুই বোন। দুজনেই শি'খি'কা। সব মিলিয়ে দলে হয়েছি আপাতত ষোলো জন। অন্য কামরায় আর ক'জন আছে তখনো জানি না। মোট কথা দলটি পঁচিশ জনের কমই হবে। আর ডাক্তারবদ্যি বলতে একজনই। সালকিয়ার প্রিয় ঘোষ। অবশ্য ও একাই একশ'।

আমরা যে খোপে বসেছিলাম সেখানে অন্য চারটে শয়নাসনে ছিল পাঠানকোটের এয়ার ফোর্স স্টেশনে কর্মরত মিত্র পরিবার। ছেলেমেয়ে পরিবার নিয়ে দেশে ছুটি কাটিয়ে কর্মস্থলে ফিরে যাচ্ছে। বাচ্চা দুটির সঙ্গে ভাব করতে দেরী লাগল না ভারতীর। দীর্ঘ সময় এদের সঙ্গে বেশ গল্পগুজব করে কেটে গেল। পাশের আসনে ছিল তিনজন যুবক। ওরাও যাচ্ছে অমরনাথ দর্শনে। ওদের মধ্যে অন্তত দুজনের পাহাড়ে চড়ার অভিজ্ঞতা আছে। ট্রেকিং করে বেড়ায়। একজন সিনিয়ার – দলপতি গোছের। আরেকজনকে মনে হল নবীন সদস্য। প্রথমবার দলের সঙ্গে বেরোচ্ছে।

পাশের পাশের খোপে প্রিয়রা সদলবলে। মোটামুটি এক জায়গায়। ঘটনাচক্রে সেখানেই তাপস ঘটক মিতালীদের জায়গা পড়েছিল। বন্ধুত্ব হতে সময় লাগেনি। হৈ চৈ করতে করতে গান গাইতে গাইতে মাতিয়ে রেখেছে ওরা নিজেদের। এবং গোটা কামরা। বিপাশাদেবী একটু গম্ভীর প্রকৃতির। সম্পর্কে অনীতার জায়ের খুড়শাশুড়ি না কি যেন। সম্পর্কের এমন বিশদ ব্যাখ্যা ভারতীকে জানাতে ও হেসেই অস্থির। কারণ জায়ের খুড়শাশুড়ি বলে নাকি কিছু হয় না।

– হয় না মানে? আলবৎ হয়। জায়ের খুড়ো থাকতে পারে না? আর তার মিসেস খুড়শাশুড়ি হল না?

– যা বোঝ না, তা নিয়ে কথা বোলো না। জায়ের খুড়শাশুড়ি মানে তো নিজেরও খুড়শাশুড়ি।

খুঁতখুঁতে মন নিয়ে মেনে নিতে হল হয়তো তাই। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক বুঝতে এখনো বড়োই সমস্যায় পড়ে যাই। অবশ্য কে আর সম্পর্কের অতল তলে শেষ পর্যন্ত হদিশ পেয়েছে? আসলে উনি কবিতার খুড়তুতো জা। কেন যে মাথায় ঢুকল জায়ের খুড়শাশুড়ি কথাটা কে জানে!

বেহালার দুবোনের জায়গা জুটেছিল একেবারে দরজার পাশে। একটিমাত্র আসনে। আর-এ-সি টিকিট ছিল ওনাদের। বেশ কষ্ট করে জার্নি করতে হয়েছে। তবে এয়ারকণ্ডিশন কামরা হওয়ার জন্য তবু মন্দের ভালো।

হাওড়া থেকে জম্মু দীর্ঘ ১৯৬৭ কিলোমিটার পথ। আসানসোল পাটনা লখনৌ সাহারানপুর আম্বালা লুধিয়ানা চাক্কিব্যাঙ্ক হয়ে জম্মু পৌঁছনোর কথা দুপুর একটা দশ নাগাদ। চাক্কি ব্যাঙ্কে মিত্র পরিবার নেমে গেল। এখান থেকে পাঠানকোট চলে যাবে সাইকেল রিক্সা করে। নামার সময় ঠিকানা দিল। আন্তরিকতার সঙ্গে আমন্ত্রণ জানিয়ে গেল পাঠানকোটে যাওয়ার। ভারতী ছেলেমেয়েদের হাতে দিল সোপপেপারের পাতা। এত সামান্য উপহারে খুশি হওয়া সহজ নয়। তবু হল।

জম্মু পৌঁছনোর কথা সাঁইত্রিশ ঘন্টায়। পৌঁছল রাত দশটায়। মাত্র ন' ঘন্টা লেট। দেরির হার ঘণ্টায় পনেরো মিনিট। ভারতীয় রেলের প'খ' ব্যাপারটা খুব ভয়াবহ বলা যাবে না, বিদেশীরা যাই বলুক না কেন।

স্টেশনে আমাদের অভ্যর্থনা জানাল মিলন মুখার্জির সহকারী প্রসেনজিৎ। ট্রলিতে করে মালপত্র নিয়ে তুলল স্টেশনের বাইরে অপে'খ'মান গাড়ির কোটরে।

যাত্রীদলটি সম্পূর্ণ হল জম্মুতে বসে। অন্য কামরা থেকে এসেছে দেবদ্যুতি বিশ্বাস, অরুণ কুমার পাত্র, সাহেবগঞ্জের এক দিদি এবং অনীতার কর্মচারি মুক্তি। এরা চারজন দলের সংখ্যাবৃদ্ধি করল। অরুণ পাত্র এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের একজন অফিসার। কালিঘাটে রুমাদের বাড়ির কাছাকাছি তার আস্তানা। পরিবারপুত্র বাড়িতে রেখে পুণ্য সঞ্চয়ে একাই চলেছে। দেবদ্যুতিকে প্রথমে মনে হয়েছিল স্কুলের গণ্ডী ছাড়ানো কলেজে পড়া একটি মেয়ে। কী দুঃসাহস, একাই এই পথের যাত্রী হয়েছে। বার্ধক্যে মানুষের ধর্মকর্মে সাধারণত মতি হয়। নবীনাদের এসব কি মতিভ্রম হচ্ছে, কেন হচ্ছে, কে জানে!

সব মিলিয়ে দলে মহিলারা সংখ্যার জোরে দেখছি এগিয়ে — তারাই পনেরোজন। পুরুষ যাত্রী মাত্র পাঁচজন। অবশ্য ম্যানেজার মিলন মুখার্জি, সহকারী প্রসেনজিৎ, বীরেন এবং ওদের দলের অন্য দুজনকে বাদ দিয়ে। সুতরাং এই ভ্রমণপিপাসু দলটিকে প্রমীলাদল বলাই সঙ্গত। অন্যথায় ডাক্তারবাবুর দলও বলা যেতে পারে।

মালপত্র বাসে তুলে স্টেশনের বিপরীতে একটি হোটেলে রাতের ভোজনপর্ব সাঙ্গ করার ব্যবস্থা হল। হোটেলে ফিরে এত রাতে খাবার জুটবে না। জম্মু স্টেশন থেকে আহার যোগানোর ভার এখন থেকে মিলনদের।

ভারতী খেতে বসলেই আমার জামার বুকপকেটে ওর চশমার গুরুভারটা বহন করতে দেবে। সেদিনও তাই করেছিল। একজনের হাতের ধাক্কায় চশমাটা পকেট থেকে পড়ে গেল। একটা কাচ ভেঙে চুরমার। তাপি বলল — এমা, ভেঙে গেল, পিসিমণি এখন উপায়? চশমা ছাড়া চলবেন কি করে?

— ভাবিস না। চশমা ছাড়া চলাফেরার কাজটা চলে যায়, লেখাপড়া চলে না। ভারতী তার ভাইঝিকে আশ্বস্ত করল।

সবটা আশ্বস্ত করা সম্ভব হল না। মুখেচোখে অন্য এক উদ্বেগ প্রকাশ পেল। যাত্রার শুরুতেই বাধা! দুশ্চিন্তার কথা! কথাটা এভাবে ভাবলে মন খারাপ লাগবে। আর মন একবার খারাপ করা শুরু করলে, আরো খারাপ হতে থাকে। ওসব পাত্তা না দিলেই সবকিছু ঠিক আছে।

জম্মুতে রঘুনাথ মন্দিরের কাছাকাছি হোটেলে রাত্রিবাসের আয়োজন হয়েছে। তিনতলায় ঘর। লিফট আছে। প্রায় আটচল্লিশ ঘন্টা ট্রেনজার্নি করতে হয়েছে। সকলেই বেদম ক্লান্ত। ঘরে পৌঁছে বিছানায় দেহখানি ছুঁড়ে দিতে পারলেই অপার শান্তি।

জম্মু শহর নবম শতাব্দীতে রাজা জম্বুলোচন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাই এর নাম হল জম্মু। কে এই জম্মুলোচন, জানি না। ১৮৩২ সালে কাশ্মীর রাজ গুলাব সিং জম্মুরাজ্য দখল করেন। ডোগরা পাহাড়ী গুর্জর গদ্দী জনজাতি অধ্যুসিত এই প্রদেশ। সমুদ্রতল থেকে উচ্চতা ৩০৫ মিটার মানে ১০০০ ফুট।

হোটেলের ঘরে পৌঁছে প্রথম কাজ টয়লেট পর্ব সারা। সেই সঙ্গে ভালো করে একপ্রস্থ অবগাহন। বেশির ভাগ হোটেলে দেখেছি বাথ(মের ময়লা জল সহসা বেরোতে চায় না। পায়ের কাছে এমন থিকথিক করে জমে থাকে যে বিরক্ত লাগে। এখানেও তাই। তো কি আর করা? ওর মধ্যে স্নানটান সেরে নিতে হল।

হাতঘড়িতে দেখছি সময় যা হাতে আছে বড়োজোর দুঘণ্টার মতো ঘুম হতে পারে। ভোরবেলা তৈরী হয়ে ছুটতে হবে যাত্রার অনুমতির জন্যে এখানকার এম-এ-এম স্টেডিয়ামে। বাস-সওয়ারী- মালপত্র পরী'খ'া করে তবে যাত্রার অনুমতি পাওয়া যাবে। বেলা হয়ে গেলে আবার যাত্রা বাতিল হয়ে যেতে পারে। দিনে দিনে পহেলগাঁও পৌঁছনো চাই এমনভাবেই হাতে সময় নিয়ে যাত্রা শু(করতে হবে।

এদেশে সিক্যুরিটি ফোর্স যা চাইবে তা অমান্য করা যাবে না কোনমতে। এখানকার সবকিছু আর্মি-সিক্যুরিটির অঙ্গুলি হেলনে চলে। ভাবছি অত ভোরে ঘুম থেকে উঠতে পারব তো!

মিলন বলল — আমাদের লোক সকালে আপনাদের চা দেবে। তখনই সকলকে একবার ডেকে দেবে।

তাহলে তো নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। তবে মাথার ভিতরে চিন্তার পোকা বাসা বাঁধলে রিনরিন করে সেটা ঘুরতেই থাকে। ঘুরতেই থাকে। তার মধ্যে ঘুম হয়!

৩। জম্মু থেকে সড়কপথে

২রা জুলাই। ভোরে স্নানটান সেরে মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে নিচে নেমে এলাম। ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা কিছু একটা করেছিল ওরা। এত ভোরে খাদ্য গ্রহণের রুচি নেই একদম। ঘুম হয়নি ভালো করে। গা গুলিয়ে উঠছে।

বেলা হয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে। সবার হল? যাত্রীদের মালপত্র উঠেছে বাসে। রান্নার সরঞ্জামাদিও। অনেক ভোরে উঠে মিলনের দলবল খানিকটা রান্না সেরে নিয়েছে মনে হচ্ছে। লাক্সারি বাসটা মন্দ নয়। টু বাই টু সিট। পিছনে অনেকগুলো আসন খালি থেকে যাচ্ছে। বাসের সামনের দিকের সিটে কে কে বসবে এবং পিছনের দিকে কারা বসতে বাধ্য হবে, তা নিয়ে সাধারণত এই সব ক্ষেত্রে তুমুল বিবাদ হয়। আমাদের তেমন হয়নি। সামান্য গুঞ্জন উঠেছিল মাত্র। আমরা দুজন এই দলে বয়োজ্যেষ্ঠ। বাসের মাঝামাঝি আসনে বসতে পেরেছিলাম। অসুবিধা হয়নি।

আজকে আমাদের যেতে হবে পহেলগাঁও। সে প্রায় ৩১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পথ। সমতলে এতটা দূরত্ব ভয়াবহ না হলেও পাহাড়ী অঞ্চলে একে বিশাল দূরত্ব বলেই মান্য করতে হবে। সবকিছু ঠিকঠাক চললেও পৌঁছতে পৌঁছতে সেই সন্ধে।

গাড়ি ছুটল স্টেডিয়ামের দিকে। সকলে আরেকপ্রস্থ জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল — জয় বাবা অমরনাথ কি জয়।

স্টেডিয়ামে তখন অনেক গাড়ির লাইন পড়ে গিয়েছে। একে একে সামনের দিকের গাড়ি লাইন ধরে ধরে এগোচ্ছে। আমরা চলেছি তাদের পিছনে পিছনে।

একটু পরে দুঃসংবাদ এল — আমাদের যাত্রার নাকি অনুমতি পাওয়া যাচ্ছে না।

— সে কী কেন? অনেকে একসঙ্গে চিৎকার করে উঠল।

— কি যেন একটা গণ্ডগোল হয়েছে।

— কিসের গণ্ডগোল?

প্রিয়র কাছ থেকে জানা গেল সমস্যা গভীর। দলের কিছু যাত্রীর জন্য দর্শনের তারিখ নির্দিষ্ট হয়েছে ৫ই জুলাই। যাদের দর্শন তারিখ ৫ই জুলাই, তারা আজকে পহেলগাঁও উদ্দেশে যাত্রা করতে পারে। অন্য যাত্রীদের জন্য দর্শনের তারিখ নির্দিষ্ট হয়েছে ৬ই এবং ৭ই জুলাই। এই দুটি দলকে আগামীকাল এবং পরশু যাত্রা করতে হবে। আজকে তাদের অমরনাথ যাত্রার অনুমতি পাওয়া যাবে না।

আমাদের দলের সদস্যদের যে এমন তিনদিনে দর্শনের ব্যবস্থা হয়েছে আমরা কেউ তার বিন্দুবিসর্গ জানি না। আসলে পর্যটক সংস্থা অমরনাথ যাত্রার নাম পঞ্জীকরণ ব্যবস্থা করবে বলে কথা হয়েছিল। ওরাই সেই মতো অনুমতিপত্র সংগ্রহ করেছিল। ছবিসহ যে অনুমতিপত্র জম্মু-কাশ্মীর পর্যটন সংস্থা থেকে দেওয়া হয়েছে সেসবও ওদের কাছেই রয়েছে। এসব জেনে যাত্রীরা ভীষণ 'খু'ব্ধ হয়ে উঠল। এরকম কথা তো ছিল না।

— এমন ব্যবস্থা করেছিল কেন ওরা? এই বাসে তো সকলকেই যেতে হবে। তাহলে আলাদা আলাদা দর্শন-তারিখ করা হল কেন?

— ওরা ব্যবস্থা করেছে, ওরা বুঝুকগে। চুপ করে থাকো।

— ম্যানেজারটি মোটেই চালাক চতুর নয়।

— মিলনকে দিয়ে কাজ হবে না।

প্রিয় এগিয়ে গেল মিলনকে নিয়ে। এরকম সব ক্ষেত্রে ওই সামনে এগিয়ে যায়। জটিল সমস্যার মোকাবিলা কি করে করতে হয়, তা ও ভালো করে জানে। প্রিয় যুদ্ধে হারতে জানে না। পরে আমরা দেখেছি যে সমস্ত রকমের সমস্যার মুস্কিল আসান হল প্রিয়রঞ্জন ঘোষ। পদে পদে তার পরিচয় পেয়েছি। প্রিয়র সঙ্গে এগিয়ে গেল তাপস ঘটক।

জম্মু-কাশ্মীর সরকারের যে কর্মচারীটি অনুমতিপত্র পরী'খ'া করে ছাড়পত্র দিচ্ছিল তাকে অনেক অনুনয় বিনয় করে প্রিয়রা বলছিল। সেই কাশ্মীরি যুবকটি কিন্তু নাছোড়বান্দা। প্রিয়ও ছাড়ে না তাকে। কতদূর থেকে আমরা এসেছি। বেশির ভাগ জেনানা। এক সঙ্গে মিলে বাস ভাড়া করা হয়েছে। এখন এদের একদলকে রেখে আরেকদল চলে যাবে কি করে? মেহেরবানি করে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা ক(ন।

অবশেষে মুখপাত্রটি বলল — আমার প'খে' কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না। ওই যে অফিসারটি দেখছেন ওনাকে বলুন। উনি অনুমতি দিলেও দিতে পারেন। আমার প'খে' আইনের বাইরে পা ফেলা অসম্ভব।

— শুধু আমরা বললে হবে না। বুঝলেন তো ভীষণ ফ্যাসাদ হয়েছে। মেয়েরা চলুন আমার সঙ্গে। সকলে মিলে ওই অফিসারকে ধরতে হবে। তা না হলে কিছুতেই ছাড়ছে না। মিলনরা যে এমন গ্যাঁড়াকল করে রেখেছে একবারও বলে নি। ঘুণা'খ'রেও জানি না। চলুন চলুন সকলে। প্রিয় তাপস ঘটকরা বাসে এসে বলল সকলকে।

— চলুন তো দেখি। বলে অনীতা-কবিতা-শাশ্বতীরা দলবেধে ছুটল।

ওরা গিয়ে কর্মকর্তাকে পাকড়াও করল। নিয়মের ব্যত্যয় করতে তিনিও নারাজ। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে অনুরোধ উপরোধ টালবাহানা চলল। অন্য বাস প্রাইভেট গাড়ি টাটাসুমো একে একে বেরিয়ে যাচ্ছে। যাত্রার সময় বয়ে যাচ্ছে। বেলা বেশি হয়ে গেলে

মিলিটারি জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কে যাতায়াতের অনুমতি দেবে না জঙ্গীহানার আশঙ্কায়। তখন আর কোন উপায় থাকবে না।

বাবা অমরনাথ কি কৃপা করবেন না? তাঁর দয়া হলে তবেই সবকিছু ঠিকঠাক হয়, শুভযাত্রা হয়। এতদূর এসে সবই বানচাল হয়ে যাবে নাকি?

— ঠিক হ্যায় জানে দিজিয়ে। অবশেষে মহার্ঘ অনুমতি মিলল। একবারে শেষ পর্যায়ে।

'আর কোন কথা নয়। এক মুহূর্ত দেরী নয়। চল চল' বলতে বলতে দৌড়ে সকলে গাড়িতে উঠল। হু হু করে গাড়ি নিয়ে গেট পার হয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। এবার সিক্যুরিটি চেক হবে। প্রথমে দেহতল্লাশি করা হল। ছেলেদের মেয়েদের আলাদা আলাদা করে। প্রত্যেকের সুটকেশ-ব্যাগ-হাতব্যাগ সব খুলে খুলে ভালো করে দেখাতে হল। আপত্তিকর জিনিস কিছু পাওয়া গেল না। এসব করতে গিয়ে বাক্সের সাজানো গোছানো জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। তখন আরেক ঝামেলা, লক লাগছে না। জিনিস উপছে পড়ছে। ঝঞ্ঝাট! কোন রকমে সে সব জড়োসড়ো করে গুছিয়ে বগলদাবা করে বাসে তোলা হল। পরে ভালো করে গোছানো যাবে। মোট কথা তাড়াতাড়ি এখান থেকে কেটে পড়তে হবে। একবার একজন অনুমতি দিয়েছে। কখন আবার আরেকজন এসে সেটা বাতিল করে দেবে কে জানে!

বাসটিকেও আগাপাস্তালা পরী'খ'া করা হল। বিশেষ করে নিচের দিকে। সমস্ত পরী'খ'ায় উত্তীর্ণ হয়ে একসময় আমরা মুক্তি পেলাম।

সামনে গাড়ি এগিয়ে নিয়েছি। সিক্যুরিটির চত্বর ছেড়ে বেরিয়ে যাব, তখন আরেক বাঁধা। না ঠিক বাঁধা নয়। অনুরোধ কিন্তু অনেকটা শর্তের মতো। কয়েকজন সাধু-সন্ন্যাসীকে বাসে করে বিনে পয়সায় নিয়ে যেতে হবে পহেলগাঁও পর্যন্ত। রাজী না হয়ে উপায় নেই! সিক্যুরিটির ঈঙ্গিত পেয়ে কয়েকজন সাধুবাবা গাড়ির ছাদে চড়ে বসল। কয়েকজন ঢুকে বসল গাড়ির ভেতরে।

স্টেডিয়াম এলাকা ছেড়ে বাস পহেলগাঁওর দিকে ছুটল। সকলের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

জয় বাবা অমরনাথ। বোম বোম ভোলে।

আমাদের সঙ্গে গলা মেলাল সামরিক লোকজনও।

আরেকটু হলেই কেচ্ছা হচ্ছিল যা। শেষ পর্যন্ত যে যাত্রা করতে পেরেছি তা নিশ্চয়ই বাবা অমরনাথের কৃপা। এ ব্যাপারে অধিকাংশই সুনিশ্চিত। সাধুবাবাদের দলটিকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হচ্ছে খানিকটা অনিচ্ছাসত্ত্বেও। আবার ভাবছি — সংসারত্যাগী এই সব মানুষেরা এমনি করেই তো পথ পার হয়। মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে বেড়ায়, দেশ থেকে দেশান্তরে যায়। অন্ন যোগাড় করে। না হয় আমরাও একটু সাহায্য করলাম। কী আর এমন 'খ'তি হল আমাদের।

আমরা গুরু পূর্ণিমায় দেবদর্শন করতে চলেছি। সেই মতো যাত্রার ব্যবস্থা হয়েছে। অমরনাথ যাত্রা চলে রাখ পূর্ণিমা পর্যন্ত। এ বছর ৫ই জুলাই মানে ২০শে আষাঢ় পূর্ণিমা পড়েছে। ৪ঠা আগস্ট অর্থাৎ ১৯শে শ্রাবণ পড়ছে রাখীপূর্ণিমা। সেদিন রাখী উৎসব। অমরনাথের বিখ্যাত ছড়ি যাত্রা এবং পূজা হয় এই রাখীপূর্ণিমায়।

মনে পড়ছে অনেকদিন আগে কাশ্মীর এসেছিলুম আমরা দুজনে। সে প্রায় পঁচিশ বছর আগে। ছিয়াত্তর সনের জুন মাসে। চন্দনের মেজদা মেজর অমলেন্দু পণ্ডিত তখন মিলিটারিতে। কাশ্মীরে পোস্টেড ছিলেন। তার আস্তানা আশ্রয় করব বলে বেরিয়েছিলাম। আকণ্ঠ ঋণ করে সেবারের বেড়িয়ে পড়া। চন্দন আর শঙ্করকে নিয়ে আমরা চারজন। চন্দনের সঙ্গে আমাদের সেটাই ছিল প্রায় শেষ বেড়ানো। এবং এই জ্ঞানার্জন লাভ হল যে অবিবাহিত বন্ধুদলের সঙ্গে বিবাহিতদের ভ্রমণ নিষিদ্ধ। শঙ্কর আজ আর ইহলোকে নেই। কাশ্মীরের দিকে যখন গাড়ি ছুটল শঙ্করের কথা খুব মনে হচ্ছিল। চন্দনের সঙ্গেও দূরত্ব খানিকটা বেড়েছে। বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে।

ক্যান্টনমেন্ট নগর উধমপুর জম্মু থেকে ৬৮ কিলোমিটার। প্রায় সমতল পথ। এরপর পাহাড় শ্রেণির শুরু। হিমালয় পর্বতমালার সর্বনিম্নে রয়েছে শিবালিক পর্বতমালা। সমতল থেকে উপরে ওঠার প্রথম ধাপ। তারপর ধৌলাধার পর্বতমালা এবং তারও পরে পীরপঞ্জাল পর্বতমালা। কাশ্মীর দেশ পীরপঞ্জাল পর্বতমালা পার হয়ে এক প্রশস্ত উপত্যকায়। আরো উত্তরে রয়েছে নাঙ্গা পর্বতমালা।

উধমপুর একটি জেলাশহর। একদা ছিল জঙ্গল ও বন্য জীবজন্তুর আবাসস্থল। বর্তমানে এখানে বড়ো আকারে মিলিটারি আস্তানা বসেছে। শহুরে কাণ্ডকারখানা তাই বাড়ছে।

প্রাক্তনে কাশ্মীররাজ গুলাব সিংএর পুত্র উধম সিং এখানে শিকার করতে আসতেন। তার ইচ্ছে ছিল এখানেই এক শহর প্রতিষ্ঠা করার। অকালমৃত্যুর জন্যে করা সম্ভব হয়নি। মহারাজা গুলাব সিং পুত্রের মনস্কামনা পূর্ণ করতে তার নামে এই শহর প্রতিষ্ঠা করেন। এটাই প্রকৃত ঘটনা কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। কেননা আরেকটি মতে এই জায়গাটির নাম ছিল বুরহাপুর। পরে কোন এক মিয়া উধম সিংএর নামে এর নাম উধমপুর রাখা হয়। সেই খ্যাতিমান উধম সিং-এর আর কোন পরিচয় জানি না।

কাটরা হল উধমপুর জেলার আরেকটি শহর। কাটরা থেকে তেরো কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে ত্রিকুট্ট বা ত্রিকূট পর্বতগুহায় রয়েছে বৈষ্ণোদেবীর মন্দির। অত্যন্ত জাগ্রত দেবী।

গাড়ি ছুটছে বেশ জোরেই। চলার পথে মাঝেমধ্যেই মিলিটারি জিপ সঙ্গ দিচ্ছে। একটা যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব চারিদিকে। অগ্নিবর্ষণকারী মেসিনগান বসানো জিপের মাথায়। সশস্ত্র সেনাদল সচকিত। সমস্ত পথ জুড়েই অবিরাম ফৌজি পাহারা দেখতে পাচ্ছি।

ফৌজের হাতে গাদা বন্দুক রাইফেল নয়। অটোমেটিক-সেমিঅটোমেটিক রাইফেল, স্টেনগান-মেসিনগান কি নেই তাদের কাছে। অল্প কিছু দূরে দূরে তাদের অবস্থান দেখা যাচ্ছে। এমনভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন একজনকে অন্যজন ল'খ্য রাখতে পারে। ওরা রয়েছে কখনো বালির বস্তার আড়ালে অথবা পাথরের অন্তরালে। কখনো গাছের আবডালে। এমন কি খোলা রাস্তায় কখনো কখনো। আবার উঁচু বাড়ির ছাদে, পাহাড়চূড়োয়, গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মোড়েও তাদের দেখা পাওয়া যাচ্ছে। জম্মু থেকে অমরনাথ পর্যন্ত গোটা রাস্তা ধরে এই সকল সেনাদের দেখেছি। এভাবে বনজঙ্গল ও পাহাড়ের দীর্ঘ পথ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পাহারা দিয়ে রাখা সহজ কথা নয়। কখন কোথায় জঙ্গীরা চুপিসারে পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে পড়বে বলা যায় না।

একটা ব্যাপার আমাদের ভালো লাগল খুব। প্রহরীরা প্রায় সকলেই হাত তুলে হাত নেড়ে সোৎসাহে অমরনাথ যাত্রীদলকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে। হাসিমুখে বলছে – বোম ভোলে।

শুনেছি অমরনাথ যাত্রা শুরু করার আগে সেনাবাহিনী রাস্তার দুপাশের গ্রাম-জনবসতি এলাকায় ব্যাপক তল্লাশি চালায়। মাইন-বিস্ফোরক-অস্ত্রশস্ত্রের খোঁজে। খোঁজে আত্মগোপন করে থাকা কাশ্মীরি বা পাকিস্তানী জঙ্গীদের। সুর'খ'ার কাজে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সঙ্গে থাকে বর্ডার সিক্যুরিটি ফোর্স (বিএসএফ), সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ) এবং জম্মু-কাশ্মীর পুলিশ। এই শেষোক্ত বাহিনী নিয়ে অনেকের আবার সন্দেহ আছে। জঙ্গীদের সঙ্গে যোগসাজসের।

উধমপুর থেকে আটত্রিশ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে পাওয়া গেল কুঁদ। জম্মু থেকে দূরত্ব ১০৬ কিলোমিটার। এখানকার উচ্চতা ১৭৩৮ মিটার বা ৫৭০০ ফুট। আমরা আর সমতলে নেই। পাহাড়ী পথে বেশ কিছুটা চড়াও হয়েছি। কিছুদূরেই পাটনীটপ। ছ বছর আগে বৈষে(াদেবী বেড়াতে গিয়ে কাটরাতে বসে প্রথম জেনেছিলাম পাটনীটপের কথা। জঙ্গী আশঙ্কায় যারা শ্রীনগর যেতে ভয় পাচ্ছেন, তাদের জন্যে দীর্ঘকায় দেওদার-পাইনে ঘেরা পাটনীটপে নতুন একটি পর্যটন কেন্দ্র খোলা হয়েছে। শীতের মরশুমে এখানে বরফ পড়ে খুব। এই সেই পাটনীটপ? আমরা গরমকালে যাচ্ছি বলে বরফ দেখতে পেলাম না। সবুজ পাইন-ফার গাছে ছাওয়া মনোরম জায়গাটি দুচার দিন বিশ্রামের প'খে' সত্যিই আদর্শ। পাটনীটপ মিনি গুলমার্গ নামে পরিচিত হচ্ছে আজকাল।

কুঁদ থেকে বাটোট (১৫৬০ মিটার বা ৫১০০ ফুট) প্রায় কুড়ি কিলোমিটার দূরে। জম্মু থেকে ১২৩ কিলোমিটার। সেনারা পথে গাড়ি দাঁড়াতে দিচ্ছে না। বলছে – রুখনা নেহি, চলতে চলো।

আসলে অতর্কিত জঙ্গী আত্র(মণের ভয়ে ওরা সাবধান হচ্ছে। আমাদের সাবধান করছে। দীর্ঘপথে একেবারে না দাঁড়ালেই বা চলে কি করে? একটু চা না হলে চলে না। তারপর জলবিয়োগের ব্যাপারও তো থাকে।

প্রিয়রঞ্জন বেশি'খ'ণ চুপচাপ থাকে না। হৈচৈ করে আনন্দে সময় কাটাতে জানে। সেই সঙ্গে মিতালী-কবিতা-অনীতারাও দেখছি কম যায় না। ইয়ার্কি ফাজলামি আড্ডায় হুল্লোড় করতে করতে চলল। তার মধ্যে গান গাইতে শু(করল। যার যেমন স্টক। অন্যরা পারলে গলা মেলাল। অন্তা'খ'রী গান গাইল। তাল দিয়ে যাচ্ছে রুমা-শাশ্বতী-তাপিরা। এমন না হলে পথ চলার একঘেয়েমি থেকে রেহাই পাওয়া যাবে কি করে?

বাস ছুটছে। পাহাড়ের পর পাহাড় পার হয়ে যাচ্ছে। সবুজে ছাওয়া পাহাড়। ন্যাড়া পাহাড় । কাদামাটির পাহাড়। গ্রানাইটের পাহাড়। না ওটা কমই চোখে পড়ল। আগের তুলনায় পথঘাটের বেশ উন্নতি হয়েছে। মসৃণ সড়ক। মাঝমধ্যে ভাঙাচোরা রাস্তা দেখতে পাচ্ছি বটে তবে খুবই কম। আগের বারে জম্মু থেকে শ্রীনগর যাত্রা করতে চোখে জল এসে গিয়েছিল। বাসের একেবারে পিছনের সারিতে বসার জায়গা পেয়েছিলাম। এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় বাস দৌড়চ্ছিল যখন, তখন কেউ যেন আসন থেকে আমাদের বারবার উপরে ছুঁড়ে দিচ্ছিল। সারা পথ আমাদের নিয়ে লোফালুফি খেলা হয়েছে। আসনে বসার থেকে দাঁড়িয়ে যাওয়া সোজা। দুঃসহ কষ্টভোগ করেছি সেবার।

বাটোটের পর চব্বিশ কিলোমিটার দূরে রামবান। ২২৫০ ফুট উচ্চতায়। তার মানে অনেকটা নিচে নেমে আসতে হল। বাটোট থেকে প্রায় ৩০০০ ফুট। এখানে এক জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কথা শুনেছিলাম। রামবান থেকে আরো সাতাশ কিলোমিটার দূরে পড়ছে বানিহাল সুড়ঙ্গ। জম্মু থেকে মোট দূরত্ব ১৭৫ কিলোমিটার। তার মাঝে পড়ল শতান নালা। বাস থামছে না আর কোথাও। সতর্ক প্রহরীদল থামতে দিচ্ছে না।

বানিহাল এশিয়ার দীর্ঘতম সুড়ঙ্গপথ। ১৯৫৬ সালে নির্মিত হয়েছিল এই সুড়ঙ্গপথ প্রায় ৫৮৮০ ফুট উচ্চতায়। তিন কিলোমিটার লম্বা। পীরপঞ্জাল পর্বতমালা ভেদ করে কাশ্মীর উপত্যকায় যাওয়ার প্রবেশদ্বার। এখন এটি দ্বিমুখী। আগে একটিমাত্র সুড়ঙ্গপথ ছিল। বানিহাল শ্রীনগরের সঙ্গে জম্মুর দূরত্ব কমিয়ে দিয়েছে একলাফে প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার।

বানিহাল কথার মানে নাকি তুষারঝড়। হয়তো আগে এখানে প্রবল তুষারঝড় হত। বর্তমানে বানিহাল সুড়ঙ্গের নাম হয়েছে জওহর টানেল। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর নামে। উনি কাশ্মীরের পণ্ডিত পরিবারের লোক ছিলেন।

সুড়ঙ্গের মুখে সুর'খ'া ব্যবস্থা সঙ্গতকারণেই আরো কড়া। এখানে আরেক প্রস্থ খানতল্লাশি হল। তারপরে সুড়ঙ্গে প্রবেশের অনুমতি জুটল।

বেগে গাড়ি চালিয়ে টানেল পার করে যেতে হবে। কোথাও অপে'খ'া করা চলবে না। গাড়ি ভিতরে ঢুকতেই অন্ধকারে চোখ ধাঁধিয়ে গেল। একটু পরে দেখা গেল ভিতরের কংক্রিট দেয়ালে 'খ'য়াটে মিটমিটে আলো জ্বলছে। কেমন ভূতুড়ে পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। বাসের মধ্যেও সকলে চুপচাপ।

এক সময় সুড়ঙ্গ পেরিয়ে এলাম। অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণ হল যেন। এত'খ'ণে মনে হল সত্যি আমরা ভূস্বর্গে এসে পড়েছি। নীচের সমতলভূমি যেন মর্ত্যলোক। সেখান থেকে আমরা ইন্দ্রলোকে এসে পড়েছি। চিরসুন্দর কাশ্মীর উপত্যকায়।

চারিদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা সবুজ উপত্যকা। বহুদূর বিস্তৃত সেই সবুজ প্রান্তরের শ্যামলিমা। মৃদুমন্দ খুশির বাতাস বইছে। চিরবসন্ত এখানে। শান্ত নির্জনতা। ধ্যান গম্ভীর ভূধর হিমালয় সর্বত্র সুন্দর। কিন্তু কাশ্মীরে তার রূপের যেন কোন তুলনাই চলে না। কাশ্মীর এক অনন্য অভিজ্ঞতা। সবুজে পাথরে বরফে ঝর্ণায় সমুজ্জ্বল। রঙিন ফুলে উদ্বেল। কাশ্মীরি সাধারণ মানুষও দারুণ সুন্দর। টুকটুকে রাঙা আপেলের মতো তাদের গায়ের রঙ। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই রূপবান-রূপবতী। আমাদের দুর্ভাগ্য যে রাজনীতি আর গোলা বারুদের গন্ধে আর তেমন পবিত্র নেই এই কাশ্মীর। খুশিয়ালি উধাও হয়েছে। ভয়ানক দারিদ্র্য নেমে এসেছে সাধারণ মানুষের জীবনে। অবিশ্বাস সন্দেহ আর ঘৃণা জায়গা করে নিয়েছে তাদের মনে।

কাশ্মীর কথাটি এসেছে নাকি কশ্যপ-মীর বা কাশ্যপ-মার থেকে। মহামুনি কাশ্যপ মহামায়ার তপস্যা করে তাঁকে বশীভূত করে তাঁর সাহায্যে এখানকার প্রাচীনতর কোন দানব বংশকে পরাস্ত করে দখল করেন। এবং নাগদের প্রতিষ্ঠা করে যান। কাশ্যপ মুনি ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচীর সন্তান। প্রজাপতি দ'খ' তাঁকে তেরটি কন্যা সম্প্রদান করেন। অন্যত্র বলা হয়েছে ব্রহ্মার ছয় মানসপুত্রের একজন হলেন কশ্যপ। কশ্যপ থেকে কি কচ্ছপ শব্দ জাত?

কাহিনীতে বলে — মহামুনি কাশ্যপের স্ত্রীর নাম কদ্রু। কদ্রুর সকল সন্তান নাগজাতীয়। তাঁদের নিয়ে কাশ্মীরে বসবাস করতেন মহামুনি। তখন এখানে সতীসর বা সতীসায়র নামে হ্রদ ছিল। তার জল থেকে জন্মাল জলোদ্ভব নামের এক অসুর। তাকে হত্যা করে কাশ্যপ ঋষি এই দেশ নাগদের জন্যে নিষ্কণ্টক করেন এবং নাগবংশের স্থাপনা করেন।

মহাভারতে বলা হয়েছে গাণ্ডীবধন্যা অর্জুন রাজসূয় যজ্ঞের আগে কাশ্মীর জয় করেছিলেন। সুদূর বঙ্গদেশ থেকেও কোন এক রাজা এখানে এসেছিলেন। গল্পটা এখুনি মনে পড়ছে না।

বানিহাল থেকে বোধ নয় চব্বিশ কিলোমিটার দূরে ভেরিনাগ। ৬০০০ ফুট উচ্চতায়। এখানকার প্রস্রবণ থেকে ঝিলম নদীর উৎপত্তি। 'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা' — রবীন্দ্রনাথের শব্দগুচ্ছ মনে গেঁথে আছে। শ্রীনগর হয়ে ঝিলম চলে গিয়েছে সিন্ধুনদের উদ্দেশ্যে। ঋগ্বেদের যুগে ঝিলমের নাম ছিল বিতস্তা। সেই ঝিলমের উৎস হল ভেরিনাগ। ঝরণা বাগিচা মন্দির সবই আছে ভেরিনাগে। স্বচ্ছ জলে অজস্র ট্রাউট মাছ। সম্রাট জাহাঙ্গীর-নুরজাহানের প্রিয় উদ্যান এখানে।

আমাদের যাত্রাপথে পড়ল আপার মুন্ডা। বলতে গেলে এপথে সর্বোচ্চ স্থান। প্রায় ৭২২৪ ফুট উচ্চতায়। আরো বত্রিশ কিলোমিটার এগিয়ে গেলে পথে পড়ল কাজিকুন্ড। এটি একটি ব্যবসাকেন্দ্র বলেই মনে হল। এখানে বাস থামিয়ে চা-জলখাবার খাওয়া হল। আশেপাশে কয়েকটি দোকানে কাশ্মীরি পসরা সাজানো। কাজু আখরোট কাঠবাদাম কাঠের আসবাবপত্র গরমপোষাক ইত্যাদি। আমরা এখন তীর্থপথের যাত্রী। কেনাকাটা সব ফেরার পথে হবে। আগে তো দেবদর্শন।

আরো প্রায় কুড়ি কিলোমিটার সামনে এগিয়ে পড়ল খানাবল (৫২৩৬ ফুট)। এখান থেকে শ্রীনগরের পথ বাঁদিক দিয়ে চলে গিয়েছে। জম্মু থেকে শ্রীনগর ২৯৩ কিলোমিটার। খানাবল থেকে অল্প দূরত্বে অনন্তনাগ — জেলাশহর। একেবারে খোদ জঙ্গীদের এলাকা। এখানে ঘরবাড়ি দোকানপাট অনেক। সন্ত্রাসবাদীদের আত্মগোপনের প'খ' সুবিধাজনক। সবাই এখানে সত্যজিতের জটায়ুর ভাষায় — হাইলি সাস্পিসাস্। সেনারা আনাচে কানাচে কভারের আড়ালে সতর্ক হয়ে আছে। অবশ্য তীর্থযাত্রীদের প্রতি তারা উদাসীন নয়। বোম ভোলে। বোম বোম ভোলে। জয় বাবা অমরনাথজীকি। সরবে ঘোষণা করে ধর্মপ্রীতি।

অনন্তনাগে ঝরণা আছে, বাগান আছে, শিব-রাধাকৃষে(র মন্দির আছে। এখানকার পুরোহিত নাকি বাঙালি। ঝরণার কুণ্ডে প্রচুর মাছ পাওয়া যায় কিন্তু হরিদ্বারের মতো তা ধরা হয় না। নয় কিলোমিটার দূরে রয়েছে আচ্ছাবল, প্রাচীন নাম অ'খ'বল। রয়েছে অন্যতম বৃহৎ ঝরণা তিন ধাপে নেমে এসেছে। আর সবুজ পর্বতের নিচে চমৎকার প্রমোদ উদ্যান। আরো দখিনে কোকরনাগ নামে আরেকটি প্রস্রবণ আছে।

গা হিমকরা থমথমে অনন্তনাগ-খানাবল থেকে আমাদের বাসটা ডানদিকে এগিয়ে চলল পহেলগাঁও। শহর পে(তেই মনে এল স্বস্তি। যেন আর ভয় নেই কোন।

একটু পরে লিডার নদীকে সঙ্গে পাওয়া গেল। সুন্দরী ত(ণী লিডার আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে পহেলগাঁও শহরে। উচ্ছল নৃত্যরতা লিডার। এগিয়ে চলে আমাদের বিপরীতে, ফেলে-আসা পথের দিকে। আমরা চলেছি তার উৎসের দিকে। এই পাহাড়ী উচ্ছলতার সঙ্গে সঙ্গে যেতে হবে আরো পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার পথ।

পথে পড়ছে মার্তণ্ড মন্দির। যেতে হবে আইশমোকাম হয়ে। মার্তণ্ড মন্দির ভারতের অন্যতম সূর্যমন্দির। আমাদের দেশে চারটি প্রধান সূর্যমন্দির আছে। উড়িষ্যায় কোণারক, মধ্যপ্রদেশে খাজুরাহো, গুজরাটে মধেরা এবং কাশ্মীরে মার্তণ্ড।

মার্তণ্ড মন্দির নির্মাণ করেন কাশ্মীররাজ রামদেব অথবা ললিতাদিত্য (৭২৪-৭৬০ খৃঃ)। চৌষট্টিখানি স্তম্ভের উপর ৬৩ ফুট উঁচু চতুষ্কোণ মন্দির। ধ্বংস করে সিকান্দার বাতসি খান (১৩৮৬-১৪১০)। এখন মার্তণ্ড মন্দির ভগ্নস্তূপ। অমরনাথের পূজারীরা এখানেই বসবাস করেন।

একটি মজার কথা হাল আমলে খুব প্রচলিত হয়েছে। জার্মানীর এরিক ভন দানিকেন দুনিয়া জুড়ে ঘুরেফিরে একটি অবাস্তব তত্ত্ব প্রমাণ করতে মত্ত। এখানে এই মার্তন্ড মন্দিরেও তিনি এসে গাইগার কাউন্টার যন্ত্র দিয়ে মাপজোখ করে ফতেয়া জারী করেন যে আড়াই হাজার বছর আগে গ্রহান্তর থেকে মানুষ এই মার্তণ্ড মন্দিরে মহাকাশ যানে করে অবতরণ করেছিল। বিশুদ্ধ গাঁজার থেকেও উৎকৃষ্ট এই খানিকটা সায়েন্স, খানিকটা ধর্মশাস্ত্র এবং খানিকটা ব্যবসায়ীবুদ্ধি মেশানো অনাচার। দানিকেন ভক্তরা একথায় অখুশি হলেও আমি নাচার।

৪। পহেলগাঁও

বারটি পর্বতশিখরে ঘেরা ছোট্ট পাহাড়ী শহর পহেলগাঁও অনন্তনাগ জেলায় অবস্থিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৭৫০০ ফুট উচ্চতায়।

পহেলগাঁও কথাটির মানে প্রথম গ্রাম। কি করে সে প্রথম গ্রাম হল? মধ্য এশিয়া থেকে জোজিলা পেরিয়ে লাডাক-অমরনাথ হয়ে যারা কাশ্মীরের পথে যেতে চায়, তাদের জন্য একদা এই গ্রামখানিই ছিল চলার পথে প্রথম জনপদ। তাই নাকি এই নামকরণ। অন্যরা বলে, বহেলগাঁও কথা থেকে এই জায়গার নাম হয়েছে পহেলগাঁও। এর পিছনে পুরাণ কাহিনী আছে।

দেবাদিদেব শঙ্কর পত্নী পার্বতীকে অমরকথা শোনানোর জন্যে যখন দুর্গম পথে যাত্রা করেছিলেন তখন তিনি এখানে নন্দীকে রেখে যান। ষণ্ড নন্দী শিবের একান্ত অনুচর। সেই থেকে ষণ্ড মানে বহেল নন্দিত গ্রাম হয়েছে বহেলগাঁও এবং পরে পহেলগাঁও।

পহেলগাঁওর সৌন্দর্য চারদিকের সবুজ পাহাড় আর উপত্যকার বুক চিরে হেসে হেসে নেচে নেচে চলা ফেনিল কলরোলে পাগলপারা লিডার নদীর জন্য। মানালীতে যেমন কল্লোলিনী বিপাশা, পহেলগাঁওতে তেমনি উচ্ছল লিডার।

লিডার নামকরণেরও বিশেষ কারণ আছে। কোন কোন মতে অনেক ঝর্ণা-স্রোতস্বিনীর মিলিত ধারার মধ্যে কোলাহাই হিমবাহ থেকে নিঃসৃত একটি নদীই প্রধান ধারা। সেই স্রোতধারাই লিডার। অর্থাৎ নেতাস্বরূপ। তা থেকে সম্মিলিত স্রোতধারার নামও হয়েছে লিডার। এই নামকরণ কি তবে ইংরেজদের হাতে হয়েছিল? অন্যরা বলেন — লিডার কথাটি এসেছে লম্বোদরী শব্দবন্ধ থেকে। লম্বোদর মানে পার্বতীনন্দন গণেশ। তাহলে গণেশের সঙ্গে লিডার ও পহেলগাঁওর সম্বন্ধ আছে। তার মানে নামের পিছনে রয়েছে আরেক কল্পকাহিনী। গল্প শুনতে মন্দ লাগে না। গল্প না থাকলে স্থানমাহাত্ম্যও জমে না।

একদা এদিকে কোথাও মামলীশ্বর নামে একটি গ্রাম ছিল। আদিদেব মহাদেব একদিন সেই গ্রামে পুত্র গণেশকে নিয়ে হাজির। সুন্দর গ্রামখানি দেখে তাঁর খুব পছন্দ

হল। পুত্রকে বললেন — শোন বাবা, এখানে এই গুহার মধ্যে বসে একটু ধ্যানট্যান করব, বুঝেছ তো? দেখো বাবাজীবন, কেউ যেন সেসময় আমাকে না বিরক্ত করে।

নির্দেশ দিয়ে মহাদেব তো কাজকর্ম ফেলে ধ্যানস্থ হলেন। এদিকে ফাইলপত্র নিয়ে সইসাবুদ করাতে পরিষদীয় দেবতাদের নিয়ে দেবরাজ ইন্দ্র এসেছেন মহাদেবের কাছে। গণেশকে সামনে দেখে বললেন — স্যারের সঙ্গে দেখা করতে হবে। জরুরী কথা আছে।

— না দেখা হবে না। গণেশের সাফ কথা।

তাঁকে যতই বোঝানো হচ্ছে ব্যাপারটা খুবই জরুরী, কিন্তু কাজ হচ্ছে না। গণেশজী তাঁদের একজনকেও ভিতরে যেতে দেবেন না। এদিকে দেবতারাও ছাড়বেন না। কথায় কথায় তর্ক লেগে গেল। তর্ক থেকে শু(হয়ে গেল ধুন্ধুমার যুদ্ধ। বহুকাল সে যুদ্ধ চলল। লড়াই করতে করতে ক্লান্ত গণেশের তৃষ(া পেল। গলা ভেজাতে এক চুমুকে সামনে দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর জল শুষে খেয়ে ফেললেন। নদী গিয়ে আশ্রয় লাভ করল গণেশের উদরে। পরে মহাদেব ত্রিশূল দিয়ে গণেশের পেট ফুটো করে সেই নদীকে মুক্ত(করেছিলেন। লম্বোদরের উদর থেকে নিঃসৃত হয়েছিল সেই নদী। তাই নদীর নাম হল লম্বোদর — ভেঙেচুরে তা হল লিডার।

মামলীশ্বর গ্রামে এখন পাথুরে শিবমন্দির আছে।

লিডারের আরেক নাম নাকি নীলগঙ্গা। এই নামের পিছনেও আছে এক পুরাণকথা। চন্দনবাড়ি এবং পিসুটপের মধ্যে তীর্থস্থানেশ্বর নামে কোন এক জায়গায় শঙ্কর-পার্বতী একদা মধুযামিনী যাপন করেছিলেন। সেদিন শঙ্করের প্রেমচুম্বনে সিক্ত(হয়ে গিয়েছিল পার্বতীর আঁখিপল্লব। পার্বতী স্রোতস্বিনীর স্নিগ্ধ জলধারায় আঁখিপল্লব থেকে নীল কাজল ধুয়ে ফেলেছিলেন। সেই কাজল ধৌত জলে নদীর স্ফটিকস্বচ্ছ জলধারা নীলাভ হয়ে উঠেছিল। সেই থেকে লিডারের আরেক নাম নীলগঙ্গা।

আমরা যখন পহেলগাঁও পৌঁছই তখন বিকেল হয় হয়। সেখানে সকালের মতো আরেকটি গণ্ডগোল অপে'খ'া করছিল আমাদের জন্যে, তা কে জানত?

শহর থেকে অনেকটা দূরে নদীর ধারে আমাদের বাসযাত্রার বিরতি হল। শহরের ভিতরের দিকে আর বাস যাবে না। এবছরে এখানেই বেসক্যাম্প স্থাপিত হয়েছে। এখান থেকেই সকল অমরনাথ যাত্রীদের যাত্রা শু(করতে হবে। এদিকে শহরের ভিতরে আমাদের নিজস্ব হোটেলের ব্যবস্থা করা আছে। কিলোমিটার দুয়েকের মতো দূরে। আমরা থাকব সেখানে। মালপত্র সেখানে জমা রেখে যাব অমরনাথ যাত্রায়। এখন এতটা পথ লোটবহর বয়ে নিয়ে যাব কি করে?

ম্যানেজার মিলন বলল — মালপত্র নামিয়ে হাতে করে নিয়ে যেতে হবে। উপায় নেই। গাড়ি আর যাবে না।

বলে কী পাগলের মতো! মহিলা-পু(ষ স'খ'ম-অ'খ'ম নির্বিশেষে মালপত্র বগলদাবা করে দু'কিলোমিটার পথ ঠেঙিয়ে উঠতে হবে আমাদের হোটেলে। তা না হলে এখানকার সরকারী যাত্রীনিবাসের ব্যবস্থা আছে, সেখানে রাত্রিযাপন করতে হবে। সরকারী ব্যবস্থাদি করা হয়েছে বিনামূল্যে। বেশির ভাগ সাধারণ যাত্রীরা অবশ্য তাই করছিল। তারা সেভাবে তৈরী হয়েই এসেছে। আমাদের প'খ' এমন ব্যবস্থা মেনে নেওয়া অসম্ভব। সম্ভ্রান্ত ঘরের মানুষজন রয়েছে দলে। অধিকাংশই মহিলা। তারা কি পারে এতটা পথ মালপত্র বয়ে বয়ে নিয়ে যেতে?

কোন একটা উপায় করতেই হবে। স্বাভাবিকভাবে মেয়েরা প্রবল চেঁচামেচি শু(করে দিল।

অনীতা তো মিলনকে আচ্ছা করে ধোলাই দিল — ম্যানেজার হয়েছে না ছাই হয়েছে। কি ব্যবস্থা করেছেন বলুন তো! আগে থেকে লোক পাঠিয়ে কি করলেন বলুন দেখি। একটা কাজ গুছিয়ে করতে পারলেন না।

জানা গেল গাড়ি নিয়ে শহরের মধ্যে একেবারেই ঢুকতে পারা যায় না, তা নয়। তবে তার জন্যে আগাম অনুমতি দরকার। আমাদের সেই অনুমতি নেই। নেই কেন? তার মানে আগাম অনুমতি নেওয়া হয় নি। একথা জেনে সকলে আরো খেপে গেল।

আরেক দফা মিলনকে নিয়ে পড়ল। ম্যানেজারের অবস্থা সঙ্গীন। মিলন বোঝাতে চেষ্টা করল — এরকম ব্যবস্থা আগে ছিল না, এবারেই প্রথম করা হয়েছে। তার ফলে আমরা আগে থেকে জানতে পারি নি।

— ফালতু ম্যানেজার। কোন কর্মের নয়। যান যান ব্যবস্থা করুন।

সমস্যা প-াস ডাক্তারবাবু মানে সমাধান। হাল ছেড়ে দেবার পাত্র প্রিয় নয়। এরকম একজনের ব্যবস্থাপনায় বেড়াতে পারলে সত্যি পরম নিশ্চিন্তে চলা যায়।

প্রিয় তখন মিলনকে নিয়ে সোজা মিলিটারি এক কর্মকর্তার কাছে গিয়ে উপস্থিত হয়ে বলল — এই দেখুন না কি মুস্কিলে পড়েছি। আমি মিলিটারি ডাক্তার। কোলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে আছি। এই দেখুন আইডেন্টিটি কার্ড। বুঝেছেন তো — বাড়ির লোকজন নিয়ে অমরনাথজী দর্শন করতে যাচ্ছি। হোটেল হিলপার্কে আমাদের রুম বুক করা রয়েছে। কোলকাতার সব বড়ো ঘরের লেডিরা সঙ্গে রয়েছে। আপনার লোকজন সব বলছে গাড়ি নিয়ে হোটেলে যেতে দেবে না। বলুন তো মালপত্র নিয়ে কি করে যাওয়া যায়? মেহেরবানি করে একটা ব্যবস্থা করে দিন যাতে বাস নিয়ে আমরা হোটেল অবধি যেতে পারি।

অক্লেশে অনুমতি সংগৃহীত হল। এবারে প্রিয়কেও দেখলাম বেশ 'খু'দ্ধ হয়ে উঠেছে ম্যানেজার মিলনের উপর। বলল — তোরা আগে থেকে লোক পাঠিয়ে এটুকু পর্যন্ত করতে পারিসনি।

ঝুপ ঝুপ করে অন্ধকার নেমে এসেছে। বাস এসে থামল বাস টার্মিনাসের পিছনে হোটেল হিলপার্কে। বেশ খানিকটা চড়াই পথে উঠে হোটেলের সামনের খানিকটা ফাঁকা জায়গায়। চত্বর ছাড়িয়ে একটু উঠে কয়েকধাপ সিঁড়ি। চারদিকটা শুনশান। কাছাকাছি আর কোন হোটেল নেই। সামনে একটু বাগান মনে হচ্ছে। পিছনে উঁচু পাহাড় আছে? ওদিক থেকে আবার কোন সন্ত্রাসবাদী একে-৪৭ নিয়ে নেমে পড়বে নাতো?

একতলায় আমাদের জন্য সংর'খ'ত রয়েছে সার সার ঘর। কে কোন ঘর নেবে? প্রিয়-তাপির পাশের ঘরে সাধনা-রুমা। অনীতা-কবিতা এক কামরায়। অ(ণ পাত্র এক ঘরে গেল মুক্তিকে নিয়ে। দেবদ্যুতি সাহেবগঞ্জের কাকিমার সঙ্গে ফিট। ঘটকবাবুরা দুজনে এক ঘরে। শাশ্বতীরা মা-কাকিমাকে নিয়ে তিনজনে একঘরে ঢুকে পড়ল।

বাস থেকে যার যার মালপত্র নামিয়ে নিয়ে হাতপা ছড়িয়ে বিশ্রাম। সারাদিন বাসযাত্রার একটানা ধকল গিয়েছে। স্নানাহার অত্যন্ত জরুরি। বাড়িতে একটা খবর দেওয়াও দরকার। আগামীকাল যাত্রা শুরু। মনে হল একদিন পরে যাত্রা করতে পারলেই ভালো হত। বিশ্রাম হত। বয়সের ধর্ম। ধকল সইবার সামর্থ্য কমেছে। আগেকার মতো উড়নচণ্ডী মেজাজ ও সামর্থ্য হারিয়ে ফেলেছি। কিছু সময় পরে বাসস্ট্যাণ্ডে গিয়ে বাড়িতে ফোন করে খবর দেওয়া হল যে আমরা ঠিকঠাক পৌঁছেছি।

রাতে দেখা করতে এল রশিদভাই। হোলি কেভ ট্রাভেলসের মালিক। বয়স বেশি নয়। কাশ্মীরি জোব্বা অঙ্গে। যদি চান, পরদিন অমরনাথ যাত্রার জন্যে ইনি ঘোড়া-ডাণ্ডি-পিট্টুর ব্যবস্থা করে দেবে। নয়তো কাল চন্দনবাড়ি থেকে যাত্রীকে দরদস্তুর করে ঘোড়া-ডাণ্ডি নিতে হবে।

অধিকাংশ যাত্রী রসিদভায়ের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে আগে থেকেই নিশ্চিন্ত হতে চায়। কয়েকজন অবশ্য ভাবছে যে তারা পায়ে হেঁটে যাত্রা করবে। অ(ণ পাত্র পায়ে চলার একজন সঙ্গী খুঁজছিল। শক্তসমর্থ মানুষ উনি — পারবে হাঁটতে। আমরা পারব না।

সাধনা, সবিতা এবং শাশ্বতীর মা ডাণ্ডিতে যাবে। অনীতাও। বাকিরা ঘোড়ায় চাপবে। মুক্তি পায়ে হেঁটে যাবে মিলন-প্রসেনজিৎ-বীরেনদের সঙ্গে।

আমরা দুটো ঘোড়ার জন্য অগ্রিম অর্থ জমা করলাম। প্রতি ঘোড়ার জন্য আড়াই হাজার করে। চন্দনবাড়ি থেকে অমরনাথ পর্যন্ত যাওয়া এবং ফিরে আসার এটাই নাকি সরকার নির্ধারিত রেট। বললাম — আমাদের কিন্তু মানি রিসিপ্ট দিতে হবে।

— মিল জায়েগা। রসিদভাই বলল।

— ফিরে এসে দিয়ে দেব। মিলনও রসিদভায়ের কথায় সায় দিল।

প্রিয় বলল — পিসেমশাই পহেলগাঁও থেকে চন্দনবাড়ি জিপের জন্য আমাদের আলাদা টাকা দিতে হবে। সেরকমই নাকি কথা ছিল। রসিদভায়ের সঙ্গে ব্যবস্থা করা হল। মাথাপিছু বিশ-পঁচিশ পড়বে হয়তো।

– সে তুমি যা ব্যবস্থা করবে সেটাই ঠিক। কত টাকা পড়বে বল, দিয়ে দিচ্ছি।

বেশি রাত করে লাভ নেই। তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়তে হবে। আজকে রাতটাই যা বিশ্রাম। আগামীকাল থেকে শুরু হবে কঠিন যাত্রা। দুর্গম পথ। দুর্বিনীত আবহাওয়া। তিনদিন ধরে যাওয়া আর দুদিন ধরে ফেরা। মনে মনে ভয় হচ্ছে। পারব তো শেষ পর্যন্ত যেতে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে সেসব ভাবছি।

দুদিন আগে আমরা কোথায় ছিলাম। কোন সুদূরে! সেই কোলকাতায়, মানে ভারতের পূর্ব প্রান্তে। আর আজ কয়েক ঘন্টার মধ্যে কতদূরে এসে পড়েছি। ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের এক বিজন প্রান্তরে। কোথায় কোলকাতার কোলাহল আর কোথায় পহেলগাঁওর এই নিবিড় নির্জনতা। এক অচেনা জায়গায় অজানা হোটেলে ঘুমের আয়োজন করছি। পরম নিশ্চিন্তে? বোধ হয় না। যা ফাঁকা জায়গা চারদিকটা! ভয় নেই তো জঙ্গী আক্রমণের?

জানালার বাইরে ছোট্ট একফালি বাগান রয়েছে মনে হচ্ছে। তারপর উঁচু হয়ে উঠেছে পাহাড়। হোটেলটা অবশ্য মন্দ নয়। তবে বড্ডো নির্জন।

৫। চন্দনবাড়ি

৩রা জুলাই মঙ্গলবার। হোটেলে ব্রেকফাস্ট সেরে জিপ ভাড়া করে শুভযাত্রা শুরু হল। যেতে হবে ষোলো কিলোমিটার দূরে চন্দনবাড়ি। সমুদ্রতল থেকে ২৮৯৫ মিটার (৯৫০০ ফুট) উচ্চতায়।

চন্দনবাড়িতে কি অনেক চন্দনগাছ জন্মে? তাই এর নাম চন্দনবাড়ি? জানা গেল, তা নয়। শঙ্কর মহাদেব এখানে তাঁর জটাজাল থেকে চন্দ্রদেবকে নামিয়ে রেখে গিয়েছিলেন অমরনাথ যাত্রাকালে। চন্দ্র কখন চন্দন হয়ে গিয়েছে কালস্রোতে। লম্বোদর থেকে লিডার, বহেলগাঁও থেকে পহেলগাঁও, চন্দ্রবাড়ি থেকে চন্দনবাড়ি এই সব নামকরণের মধ্যে কষ্টকর কল্পনা আছে বলে মনে হল। দেবমাহাত্ম্য বাড়ানোর জন্যে সেসব করা হতে পারে।

পহেলগাঁওতে একটা কাঠের পুল ছিল। সেটা আজ আর নেই নাকি! নদীর তীরে অনেক ঘরবাড়ি হয়েছে দেখছি। এ সব তো আগে ছিল না। জায়গাটা একেবারে অচেনা লাগছে। পুরোনো স্মৃতির পহেলগাঁও আর বেঁচে নেই কোথাও। লিডার নদীর সেতু পার হয়ে ডান তীর ধরে আমরা জিপে করে যাচ্ছি। অর্থাৎ আমাদের বাঁ হাতে এখন নদীর প্রবাহ।

লিডারের তট বরাবর রাস্তা। সাদা ফেনা তুলে কলরোলে বয়ে যাচ্ছে পাহাড়ী নদী। দুধারে ঘন সবুজ অরণ্য। পথ দিয়ে গুর্জর ঘোড়াওয়ালারা ঘোড়া নিয়ে চলেছে। এরাও

চন্দনবাড়ি যাচ্ছে। তীর্থযাত্রীদের ঘোড়ায় চড়িয়ে নিয়ে যাবে অমরনাথ। সারা বছরে এই একমাস এদের বাড়তি রোজগারের ধুম।

চন্দনবাড়ি পাইন চির আর আখরোটে ছাওয়া ছোট্ট এক জনপদ। লিডারের তীরে। চারদিকে পাহাড়। সবুজ পাহাড় ঘিরে রেখেছে তাকে।

পৌঁছে দেখি অনেক মানুষের মেলা। তীর্থযাত্রীরা জমা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে চন্দনবাড়ি থেকেই অমরনাথ যাত্রার শুরু। সকলে তার আয়োজন করছে। যত তাড়াতাড়ি যাত্রা আরম্ভ করা যায় ততই ভালো। বেলা হলে মরশুম বেহাল হয়ে যেতে পারে। পাহাড়ী মরশুম বেয়াড়া ঘোড়ার মতো। কখন কি হয় তা বোঝার উপায় নেই আগে থেকে। এই ঝলমলে আকাশ তো এই মেঘমদির মুখভার।

অনেক তাবু পড়েছে। তীর্থযাত্রীদের, ভাণ্ডারার, প্রশাসনের এবং সেনাদের। কুলি, ঘোড়া আর ঘোড়াওয়ালায় চারদিক সরগরম। পথঘাট কাদায় প্যাচপেঁচে। ঘোড়ার বিষ্ঠা যত্রতত্র ছড়ানো। ছোট্ট সুন্দর পাহাড়ী জনপদ বলে মনেই হচ্ছে না। এত মানুষের মেলায় প্রকৃতির নিজস্বতা থাকে না। এমন বিপন্ন প্রকৃতি ছেড়ে যত তাড়াতাড়ি পালানো যায় ততই ভালো। ভাল্লাগছে না। বড্ড লোক গিজগিজ করছে।

আমাদের ঘোড়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। রসিদভাই ব্যবস্থা করছে। ডাণ্ডিয়ালারা কেউ এখনো গ্রাম থেকে এসে পৌঁছয় নি। সকলে বলছে – দুপুরের মধ্যেই এসে যাবে। যে কোন মুহূর্তে এসে পড়বে। ডাণ্ডির জন্যে অপেক্ষা করছে সাধনা, শাশ্বতীর মা, সবিতা আর অনীতা। শাশ্বতী ঘোড়ায় যাবে মা-কাকিমাকে রওনা করে দিয়ে।

প্রিয় প্রথম দল ঘোড়া নিয়ে এগিয়ে চলল। ভারতীর জন্যে যে ঘোড়াটা দেওয়া হল সেটায় রুমা উঠতে গিয়েছিল। ও অবশ্য যখন জানল ওটা পিসিমণিকে দেওয়া হয়েছে তখনই ঘোড়া থেকে নেমে গেল। ভাগ্যিস নেমে গেল। নয়তো ...!

একে একে আমাদের সকলের ঘোড়া এসে গিয়েছে। প্রিয়-তাপি-রুমা এগিয়ে চলল। সেই সঙ্গে কবিতা। তাপি বলল – পিসিমা আমরা এগোচ্ছি। আপনারা আসুন।

আমরা ডাক্তারবাবুর অগ্রবর্তী দলটিকে অনুসরণ করলাম। আমাদের সঙ্গে চলল দেবদ্যুতি। অরুণ পাত্র শেষ পর্যন্ত চন্দনবাড়ি এসে ঘোড়ায় সওয়ার হল। ঘটক পরিবারের সঙ্গে যাত্রা করল। সাধনা এবং অনীতা কখন ডাণ্ডি পেয়ে গেল এবং যাত্রা শুরু করেছিল, টের পাইনি।

কিছুদূর এগিয়ে আবার চেকপোস্ট। এটাই শেষ চেকপোস্ট। যাত্রীদের আরেক দফা তল্লাশি করা হল। এবার সঙ্গে স্যুটকেস নেই। পিঠে চাপানো রয়েছে একটা করে ব্যাগ।

ঘোড়াওয়ালাদের কাগজপত্র পরী'খ'া করা হল এখানে। আর কোন বাধা নেই। যদি না সন্দেহজনক কিছু মনে হয়। অর্থাৎ একেবারে সোজা শেষনাগ যাওয়ার ছাড়পত্র মিলল। বারো কিলোমিটার পথ পার হতে হবে। তারপর আবার চেকিং হবে কি না জানিনা।

লিডারের কোল ঘেঁসে এগোচ্ছি। চড়াই পাহাড়ি পথ এখনো আসেনি। পাথর ছড়ানো এবড়োখেবড়ো রাস্তা। পদচারী ঘোড়সওয়ারী সবাই হৈ হৈ করে চলেছে। প্রাথমিক উৎসাহে সকলে টগবগ করে ফুটছে।

একজন বলল — বোম ভোলে।

অন্যজন তার উত্তরে জানায় — বোম বোম ভোলে।

ঘোড়াওয়ালারা বলছে — হৌস হৌস সামালকে। সাইড সাইড।

পদচারীরা ঘোড়াকে পথ ছেড়ে দিচ্ছে। তা না হলে ঘাড়ের উপর এসে পড়বে। ঘোড়ার পিঠে মালপত্র চাপিয়ে লঙরখানা খোলার জন্যে চলেছে সেবাসমিতির লোকজন।

দুপাশে পাহাড়। সামনে পাহাড়। চারদিক ঘিরে রেখেছে পাহাড়। সামনেই দুর্গম পিসুটপ পড়বে। শুনেছি প্রাণান্তকর চড়াই। শুরুতেই কঠিন পরী'খ'া দিয়ে তারপর যেতে হবে সামনের দিকে। একবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলালকে নিয়ে এসেছিলেন শেখ আবদুল্লা শেষনাগের বিস্ময়কর সৌন্দর্য দেখাবেন বলে। পণ্ডিতজি দুর্গম পিসুটপ পার হতে পারেন নি।

আমাদের সঙ্গে ছিল দেবদ্যুতি বিশ্বাস। ছোটখাট চেহারার বাচ্চা মেয়ে। কিন্তু সেকথা ওকে বলা চলবে না। প্রবল আপত্তি ওর। বলবে — মোটেই আমি বাচ্চা নই। রীতিমতো চাকরি করছি।

একাই এসেছে এই দুর্গম পথে। একা একা একটি মেয়ে এমন করে বেড়িয়ে পড়তে পারে অজানা অচেনা দুর্গম পাহাড়ী পথে? জিজ্ঞেস করেছিলাম — কি করে একা একা বাড়ি থেকে অমরনাথে আসার অনুমতি পেলে? নিশ্চয়ই খুব সহজে ছাড়পত্র মেলেনি। অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে?

— সহজে কি মেলে?

পরে বলেছে — আমি গিয়েছিলাম ট্যুরিস্ট কোম্পানীতে দখিন ভারতে বেড়াতে যাব বলে খোঁজখবর করতে। পছন্দ হলে একেবারে বুক করে ফেলব। ওখানে গিয়ে শুনি, হাওড়ার এক ডাক্তারবাবু বিরাট এক দলবল নিয়ে যাচ্ছেন অমরনাথ। অনেক মেয়ে আছে সেই দলে। এই সব বলে জয়ন্তদা খুব তাতালো আমাকে। আমিও ভিড়ে গেলুম দলে।

বেড়ানোর নেশা ভয়ানক নেশা! নাছোড়বান্দা নেশা। একবার ধরলে ছাড়ানো যায় না। ফি বছর বেরোতে হবে। অন্তত একবার। আসলে রেলের কামরায় বসতে পারলেই মজা। ঝমাঝম করে গাড়ি চলবে। মাঠঘাট নদীনালা প্রান্তর পার হয়ে যাবে। কত মানুষের

বসতি। মাঝেমধ্যে স্টেশনে এসে গাড়ি থামবে। ঘুম ভাঙবে হকারের ডাকে — চায়ে গরম।

ভারতীর ঘোড়া পিছনে পিছনে এগোচ্ছিল। মাঝে মাঝে ল'খ'্য রাখছি। চেকপোস্ট থেকে আধঘন্টার মতো পথ এগিয়েছি সবে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি পিসু টপ আর কতদূরে। কেমন সে চড়াই! সেটাই নাকি যাত্রীদের প্রথম পরী'খ'াস্থল। পদব্রজে হৈ হৈ করে আরো অনেক তীর্থযাত্রীরা চলেছে। মহা উল্লাসে।

হঠাৎ একটা হৈ-হল্লা কানে এল। পিছনে ঘুরে তাকিয়েছি। দেখি ভারতীর ঘোড়া তড়বড় করে নদীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সওয়ারি নিয়ে ডানদিকে ক্রমশ হেলে পড়ছে। ভারতীও কাত হয়ে ঘোড়ার পিঠে ঝুলে রয়েছে। ওর ঘোড়াওয়ালা বাচ্চা ছেলে, ভারতীর জামা ধরে টানছে। চেষ্টা করছে ধরে রাখতে, যাতে পড়ে না যায়। পারছে না। বলতে বলতে চোখের নিমেষে ঘোড়া কাত হয়ে পড়ল। ভারতীও আছাড় খেয়ে শুয়ে পড়ল নিচে।

কি সর্বনাশ! একি হল ওর! পড়ে গেল কেন? ঘোড়া থামিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে এলুম। ছুটে গেলুম ওর কাছে। দেবদ্যুতিও নেমে এল সঙ্গে সঙ্গে।

সওয়ারি ফেলে দিয়ে ঘোড়াটা তত'খ'ণে হড়বড় করে উঠে দাঁড়িয়েছে। ভারতী আর উঠতে পারল না। ওকে তুলতে গেলাম। ও নদীর পারে অর্ধমৃত হয়ে পড়ে রইল। অন্যান্য যাত্রীরা সকলে হা হা করে ছুটে এল।

কোথায় লাগল? কি করে হল? ভারতীর ঘোড়াওয়ালাকে একজন যাত্রী তো ঠেঙাতে শুরু করল। রক্তপাত হয়নি দেখতে পাচ্ছি। মাথা-টাথাও ফাটে নি বলে মনে হচ্ছে। কোমরের বা শরীরের অন্য জায়গার হাড় ভেঙেছে কিনা বা ইন্টারনাল ড্যামেজ কিছু হল কিনা বুঝতে পারছি না।

— কোথায় লাগল?

কোন রকমে ভারতী বলল — অসম্ভব যন্ত্রণা হচ্ছে।

কিন্তু কোথায়? দেখছি ওর সমস্ত শরীর নেতিয়ে পড়ছে। আমি নির্বোধের মতো দাঁড়িয়ে। কি করব কিছুই বুঝতে পারছি না। গোড়াতেই এমন বিপত্তি কেন হল! অমরনাথজীর কি অভিপ্রায় নয় আমরা তাঁকে দর্শন করতে যাই? এ কি কোন পাপের ফল! নাকি নিছক দুর্ঘটনা? আচ্ছা পাপ কেন হবে? এ তো স্রেফ দুর্ঘটনা। আসলে মানসিক দুর্বলতা মানুষকে কেমন যুক্তিহীন করে দেয়!

একটু পরে ভারতীর সম্বিৎ ফিরল। বলল — হাতে তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছে। ঠাণ্ডা জল দাও।

একজন সাধু কমণ্ডলু হাতে এগিয়ে এলেন। নদী থেকে উনি বরফ গলা জল এনে ঢেলে দিলেন সযত্নে হাতের ওপর। ঠান্ডা জল পেয়ে খুব আরাম হচ্ছিল। একবার জল

দিতেই যন্ত্রণা অনেকটাই কমে গেল যেন। বলল – আঃ বাঁচলাম। কী আরাম লাগছে! আরো ঠাণ্ডা জল দাও। (মাল ভিজিয়ে জড়িয়ে দাও।

টিসুপেপার আর রুমাল হাতে জড়িয়ে দিলাম। নদী থেকে এনে ঠাণ্ডা জল দেওয়া হল বারকয়েক। ব্যথা আরো কমে আসছে। কোথাও কোনো ফোলাটোলা দেখতে পাচ্ছি না। কিছু হয়েছে কিনা বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে না।

একজন সহযাত্রী গোটাকয়েক ট্যাবলেট দিয়ে গেল। আরেকজন দিয়ে গেল এক ডিব্বা মলম। সকলেই প্রার্থনা জানাল অমরনাথজীর কাছে। যাত্রার সাফল্য কামনা করল। বলল – জয় অমরনাথজীকি। উন্‌হোনে চাহা তো আপকা সফর জরুর পুরা হো জায়গা। ইয়ে উনকি পরী'খ'া হ্যায়।

একটু ধাতস্থ হলে ভারতীকে জিজ্ঞেস করলাম – কী করে পড়লে বলোতো?

– আমি যখন থেকে ঘোড়ার পিঠে উঠে বসেছি, তখন থেকে দেখছি একটু একটু করে হেলে পড়ে যাচ্ছি। টাট্টুওয়ালা বারবার জিন ধরে টানাটানি করছিল। তখন বুঝতে পারিনি ব্যাপারটা কি।

– মনে হচ্ছে ঘোড়ার জিন শক্ত করে বাঁধা ছিল না। ঘুরে যাচ্ছিল আর তুমিও হেলে পড়ছিলে।

– তাই হবে হয়তো। তো ওমনি করে চলতে চলতে একবার উঁচু মতন একটা পাথর টপকে নিচে নামতে গিয়ে ঘোড়ার পা পিছলে যায়।

এবার ব্যাপারটা বোঝা গেল। বেঁকে বসা সওয়ারির ওজন ঠিকমতো সামলাতে না পেরে নিচে নামার মুখে ঘোড়া আরো কাত হয়ে হেলে পড়ে। পিঠের ওপর সওয়ারি নিয়ে হেলতে হেলতে সামনে এগিয়ে যায় এবং নদীর পারে একেবারে শুয়ে পড়ে। সওয়ারি পিঠ থেকে পড়ে যায়। ভারমুক্ত হয়ে ঘোড়াটা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

যাত্রার শুরুতেই এমন দুঃখজনক দুর্ঘটনা ঘটল? একেই তো বিঘ্নপাত বলে? মন দুর্বল করা ঘটনা। কি করা এখন? ফিরে যাব? মনে হচ্ছে তাই যেতে হবে। কি আর করা? ভাগ্য ভালো মনে করব যদি বড়োসরো চোট আঘাত না লেগে থাকে। তেমন নয় বলেই মনে হচ্ছে। ভারতী উঠে দাঁড়াচ্ছে এবং কথা বলতে পারছে যখন। জীবন নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারলেই হয়। নাই বা হল অমরনাথ দর্শন। জীবনলাভ তার থেকে অনেক বেশি মূল্যবান।

দেবদ্যুতি তখনো সামনে দাঁড়িয়ে। ওর দিকে আঙুল দেখিয়ে ভারতী বলল – ওই মেয়েটাকে চলে যেতে বল। সবাই আমাদের ফেলে এগিয়ে গিয়েছে। ও তাহলে একা পড়ে যাবে।

– ঠিকই বলেছ। দেবদ্যুতিকে বললাম – তুমি চলে যাও।

– আপনারা কি করবেন এখন?

– বুঝতেই পারছ আমাদের যাওয়া হচ্ছে না। ফিরে যাব। কিন্তু তুমি আর অপে'খ'া কোরো না। অনেক দেরি করলে দলছুট হয়ে একা পড়ে যাবে। চলে যাও। আমরা ফিরে যাচ্ছি চন্দনবাড়ি হয়ে পহেলগাঁও। ওদের বলে দিও।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওকে চলে যেতে হল। কথায় বলে, তীর্থের পথে পিছনে তাকাতে নেই। কেউ তাকায় না। শুধু সামনে চলা। দুর্গম পথে চলার রীতিই এটা। মানতেই হবে তা নয়, তবে মানা হয়। প্রিয়রা কিছুটা সামনে ছিল। হয়তো দেখতে পায়নি আমাদের দুর্ঘটনা কবলিত হওয়া। ওরা এগিয়ে গিয়েছে। দুর্গম পথে শুধু যে সামনে চলতে হয়। যে পারে না, সে পড়ে থাকে। ধারদেনা করে এতটা এসেও অমরনাথ আমাদের কাছে অধরাই থেকে গেল? যাত্রীরা এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা পিসুটপ পর্যন্ত যেতে পারলাম না। তার আগেই বিদায় নিতে হচ্ছে।

বসে আছি লিডারের তীরে। সাদা ফেনার তরঙ্গ তুলে নদী উচ্ছলতায় বিভোর হয়ে চলেছে। পাথরে পাথরে ধাক্কা খেয়ে চলেছে জলপ্রবাহ। ওই ধাক্কায় পাথরের কোন বিপর্যয় হচ্ছে না। খরস্রোত আরো তরঙ্গ তুলে এগিয়ে চলেছে।

একটু পরে দেখা হল প্রসেনজিতের সঙ্গে। মালপত্র লোটবহর নিয়ে ও যাচ্ছিল। সঙ্গে বীরেনদের দলবল। দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসে বলল – কি হয়েছে?

ওদের বলা হল আমাদের দৈব দুর্বিপাকের কথা। ও বলল – আস্তে আস্তে ফিরে যান চন্দনবাড়িতে। ওখানে মিলন অপে'খ'া করছে ডাণ্ডির জন্যে। দেখুন, ও কিছু একটা ব্যবস্থা করতে পারে কি না!

ভারতীর ঘোড়াওয়ালা আগেই ভেগেছে। যাওয়ার আগে তার পরিচয় পত্রখানা হাতে পায়ে ধরে চেয়ে নিয়েছে। কি মনে হল ভারতী সেটা ওকে দিয়ে দিল। চন্দনবাড়ি ফিরে গিয়ে ওর নামে কর্তৃপ'খে'র কাছে অভিযোগ জানানো যেত অবশ্য। তাতে কী হত? তীর্থযাত্রীর সঙ্গে মন্দ ব্যবহার করার জন্যে জুটত বেদম প্রহার। ওর পরিচয়পত্র বাতিল হয়ে যেত হয়তো। রুজিরোজগার বন্ধ হয়ে যেত। সেসব করতে মন চাইল না। সবটাই আপন দুর্ভাগ্য বলেই মনে হল। এর মধ্যে ওই গরীব বেচারাকে জড়াতে আর ইচ্ছে করল না।

ভারতীকে নিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে ফিরে চললাম। উল্টোপথে। আগুয়ান সকল যাত্রীদের দুর্ঘটনার বিবরণ জানাতে জানাতে। আমার ঘোড়াওয়ালা সৈয়দ সাদাসিধে বাচ্চা ছেলে। কালো মুখ করে আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে চলল।

মিলনের সঙ্গে দেখা হল যেখান থেকে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল সেখানেই। সব শুনেটুনে প্রথমে ও নিয়ে গেল আমাদের চন্দনবাড়ির সামরিক হাসপাতালে। অল্প একটু দূরে হাসপাতাল খোলা হয়েছে। যাত্রীদের সেবার জন্যে।

ডাক্তার দেখেশুনে বলল – মনে হচ্ছে শুধু হাতেই চোট। হাড় ভাঙেনি, মুচকে গিয়েছে।

— এক্সরে করা যাবে?

— না এক্সরে হচ্ছে না। আসলে মেসিন এসে পৌঁছেছে কিন্তু অন্যান্য সরঞ্জাম এসে পৌঁছয়নি। টেকনিসিয়ানও আসেনি এখনো। ভয় পাবেন না। ব্যাণ্ডেজ করে দিচ্ছি। পরে একবার এক্সরে করে নেবেন।

ব্যাণ্ডেজ করে গোটা কয়েক ব্যথার ওষুধ দিয়ে ছেড়ে দিল ডাক্তা(ার। যাই হোক না কেন কিছুতেই মন খারাপ করব না। জীবনহানি হয়নি এর জন্যে যারপর নাই কৃতজ্ঞ থাকা উচিৎ আমাদের। তেমন বড়োসরো চোট আঘাতও লাগেনি মনে হচ্ছে। তাহলে দুর্ভাগ্য বলব কেন? ওইটুকুই দুর্ভাগ্য যে অমরনাথ দর্শন হবে না। না হলে কি আর করা যাবে? ফিরে চলে যাব পহেলগাঁওতে। বিশ্রাম নেব কয়েকদিন।

হাসপাতাল থেকে ফেরার পথে ভারতী বলল — আমাকে হোটেলে রেখে তুমি চলে যাও না? আমি হোটেলে খুব থেকে যেতে পারব। না হলে তোমারও দেখা হবে না।

— দূর! পাগল হয়েছ? তা কি করে হয়। এক যাত্রায় পৃথক ফল হতে পারে? যেতে হলে দুজনেই যাব। না হলে কেউ নয়।

মিলন বলল — দেখুন দিদি এতদূর এলেন। দর্শন না করে চলে যাবেন? হাড় যখন ভাঙেনি বলছে তখন একটু কষ্ট স্বীকার করে চলে চলুন। আরেকটা ভালো ঘোড়া ঠিক করে দিচ্ছি। একজন পিট্টু নিয়ে চলুন। যাবেন?

পিট্টু মানে একজন সহায়ক — ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে সঙ্গে চলে। সওয়ারিকে ধরে থাকে। প্রয়োজনমতো সাহায্য করে। ভারতী আঁতকে উঠে বলল — আবার ঘোড়া? না না ঘোড়ায় করে ভাঙা হাত নিয়ে যেতে পারব না।

— তাহলে ডাণ্ডি করে চলুন। ডাণ্ডিতে পারবেন তো?

ডাণ্ডি মানে আট হাজার টাকার ধাক্কা। মনে মনে হিসেব করছি। টাকায় কুলোবে কিনা। ঘোড়া বাবদ রসিদভাইকে দিয়েছি আড়াই হাজার করে। তার মানে আরো সাড়ে পাঁচ হাজারের ধাক্কা। নাকি আবার পুরো টাকাই দিতে হবে? কুড়িয়ে বাড়িয়ে কত হবে মনে মনে হিসেব কষছি। আরো ভাবছি টাকায় কুলিয়ে গেলেও এই হাতভাঙা অবস্থায় আরো উপরে যাওয়া উচিৎ হবে কি?

শাশ্বতীরা বসে অপে'খা করছিল ডাণ্ডিওয়ালাদের আসার জন্যে। মিলন রশিদভায়ের সঙ্গে কথা বলে একটা দোকানঘরের উপরে কাঠের ছাউনিতে বিশ্রাম করার মতো জায়গা ঠিক করে দিল। ভারতী সেখানে গিয়েই শুয়ে পড়ল। বললাম — একটু বিশ্রাম নিয়ে দেখ কেমন থাক। তারপর ভেবেচিন্তে দেখা যাবে উপরে যাওয়া যাবে কিনা!

একটু পরে ভারতী ঘুমিয়ে পড়ল। ব্যথাটা হয়তো কমেছে। কমে গেলেও এমতাবস্থায় ওকে নিয়ে উপরে উঠবো কিনা ভাবছি। ব্যাপারটা খুব রিস্কি হয়ে যাচ্ছে না তো! ও কতটা ব্যথাবেদনা গোপন করে কথা বলছে বুঝতে পারছি না।

মাঝেমধ্যে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। আকাশ কালো হয়ে উঠছে। একখণ্ড ভাসমান মেঘ এসে পড়েছে কোথা থেকে।

শুয়ে বসে বিশ্রাম করে বেশ চাঙা হয়ে উঠল। বলল — মনে হচ্ছে এবার ডাণ্ডি হলে যেতে পারি। তবে ঘোড়ায় চড়ে নয়।

— ডাণ্ডি করে যেতে পারবে? ঠিক বলছ তো? নাকি আমার জন্য বলছ?

— না সত্যি বলছি। ডাণ্ডি হলে পারব।

হিসেব কষে দেখেছি টাকাকড়ি যা আছে কোনরকমে খরচাপাতি সামাল দেওয়া যাবে। কিন্তু আর কোন আপদবিপদ হলে মুস্কিল হবে। অর্থাভাবে পড়ব। কাশ্মীরের পথে প্রতি মুহূর্তেই বিপদ।

মিলন বলল — টাকাপয়সার জন্য এখুনি চিন্তা করার দরকার নেই। সে এক ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

মিলনকে বললাম — ডাণ্ডির জন্যে আর কত দিতে হবে?

— ঘোড়ার জন্য আড়াই তো দিয়েছেন। বাকি সাড়ে পাঁচ দিতে হবে। ও নিয়ে ভাববেন না। আগে আপনারা দর্শন ক(ন। ফিরে এসে যা হয় হবে।

— তাহলে আরেকটা ডাণ্ডি দেখুন।

রসিদভাইকে মিলন বলল — আরেকটা ডাণ্ডির ব্যবস্থা করতে হবে দিদির জন্যে।

— ডাণ্ডি মিলনাই তো মুসকিল। ঠিক হ্যায় দেখতে হ্যায়।

বেলা বাড়ছে। সকলে অস্থির হয়ে পড়েছে। আমাদের দলের অন্যরা চলে গিয়েছে অনেক'খ'ণ আগে। বাকিরা আজ শেষনাগ পৌঁছতে পারবে কি না বোঝা যাচ্ছে না। কী হল ডাণ্ডির?

রসিদভাই দেখাল — ওই দেখুন ডাণ্ডির কাঠামো সব পড়ে রয়েছে। বয়ে নিয়ে যাওয়ার কুলি নেই। এসে যাবে। খবর এসেছে ওরা আসছে।

সত্যিই তো নালার পাশে পিছনের দিকে ডাণ্ডির ভারী ভারী কাঠামোগুলো টাল দিয়ে পড়ে রয়েছে। বহন করার কুলি শুধু নেই। লোকজন এসে পৌঁছয় নি এখনো গ্রাম থেকে। এসে পড়বে আজই। যে কোন মুহূর্তে। রসিদভাই তো সেরকমই বলল। সত্যিমিথ্যে জানি না। কুলিমজদুর না আসা পর্যন্ত দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই নেই।

দেখতে দেখতে বেলা দুটো হয়ে গেল। মনে হচ্ছে আজ যাত্রা করা যাচ্ছে না। বৃষ্টি কমে এসেছে। আকাশ পরিষ্কার হয়ে উঠছে। ঠাণ্ডা জাঁকিয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে। গরমপোষাক যা পড়ে রয়েছি তা কম নয়। স্থানীয় কাশ্মীরিরা সে তুলনায় সামান্য গরম পোষাকে দিব্যি রয়েছে।

চন্দনবাড়ির এদিকটায় অনেক দোকান। নানা প্রকার পসরা সাজানো। অমরনাথ যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় সব রকম সরঞ্জাম এখানে পাওয়া যায়। পোশাক-আশাক, জুতো-

মোজা, শুকনো খাবার মায় ঔষধপত্র-ক্যামেরার রিল পর্যন্ত। সব। চা-জলখাবারের দোকানও আছে।

একটু পরে হৈহৈ করে একদল ডাণ্ডিওয়ালা এসে পড়ল। মারামারি করে তাদের বিলি বন্দোবস্ত করা হল। নির্দিষ্ট জায়গা থেকে।

ভারতীর ডাণ্ডি বইতে কাঁধ দিল চারজন কুলি। দলনেতার নাম আবদুল্লা। অন্যদের বেলায় পাঁচজন করে। এরকম কেন? প্রশ্ন করতে ওরা বলল — ওদের দলের আরেকজন আসেনি এখনো।

আরেকজন বলল — ও আ রহা হ্যায়। আসছে।

এদিকে ডাণ্ডি বিলিব্যবস্থার একজন মাতব্বর গোছের কর্মচারি তাড়া লাগাল। রীতিমতো চেঁচাতে শুরু করে দিল — চলিয়ে চলিয়ে। জায়গা সাফ কিজিয়ে। অভি তক খাড়া কিঁউ? বোলো, যানা হ্যাঁয় কি নেহি?

— হাঁ যানা তো হায়।

— তব ভাগো।

বেশি চেঁচামেচি করে লাভ নেই এখন। চারজনেই কাঁধ লাগাল। এদের মধ্যে দলনেতা আবদুল্লাই বয়স্ক। একজন মাঝবয়সী আর অন্য দুজন জোয়ান গোছের। দেরি না করে একটু পরে আমরা যাত্রা শুরু করলাম। পঞ্চম কুলিকে বাদ দিয়েই। কাজটা যে ভালো হল না তা পরে বুঝেছিলাম।

ভারতী সবিতা এবং রঞ্জিতাদিকে নিয়ে তিনজন যাত্রা করল ডাণ্ডিতে। আমি এবং শাশ্বতী ওদের রওনা করে দিয়ে ঘোড়ায় চেপে বসলাম। মনে মনে তখনও ভাবছি — যাত্রা তো করা হল, দুর্গম এলাকায় আরো বিপদের মধ্যে না পড়ি। ফিরে গেলে অন্তত পহেলগাঁওতে ডাক্তারবদ্যি ওষুধপত্র জুটত। পথে তো কিছুই জুটবে না। কাজটা কি ভালো হল?

মনের মধ্যে এই চিনচিনে ব্যথাটা সেঁটে রইল সারা'খ'ণ। আমার যাত্রাসঙ্গী হয়ে।

৬। পিসুটপ থেকে শেষনাগ

অমরনাথ যাত্রার প্রথম পরী'খ'া হল তিন কিলোমিটার দূরের পিসুটপ পার হওয়া।

পিসুটপ প্রায় খাঁড়া পর্বত। সমুদ্রতল থেকে ৩,৩৭৭ মিটার উচ্চতায় উঠে গিয়েছে। অর্থাৎ ১১,১০০ ফুটে। চন্দনবাড়ি থেকে প্রায় পাঁচশ মিটার মানে দেড় হাজার ফুট উঁচুতে উঠে গিয়েছে অত্যন্ত দ্রুত ঢালে। নদীর ধার দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ যেন ধা করে উপরে ওঠা। একমন্দিরের পাশ দিয়ে। যেমন খাঁড়াই পাথুরে পথ তেমনি তার এঁকেবেঁকে চলা। ইংরেজী জেড অ'খ'রের মতো। বারবার বাঁক নিচ্ছে। দু পা এগিয়েই সেসব

ভয়ানক বাঁক। তার উপর ভীষণ পিচ্ছিল ধাপগুলো। এবং বিশ্রী ঢালের। ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে যেতে রীতিমতো ভয় হয়। তার থেকে পায়েচলায় বিপদ কম।

টাট্টুওয়ালারা বারবার হুঁশিয়ার করছে — উঁচুতে ওঠার সময় সামনের দিকে ঝুঁকে বসতে হবে। তার মানে শরীরের ভরকেন্দ্র সামনের দিকে এগিয়ে রাখতে হবে। তাই করছি যতদূর সম্ভব সামনে ঝুঁকে। তবু বারকয়েক ঘোড়া থেকে নামতেই হল। খানিকটা নিরুপায় হয়ে খানিকটা ভয়ে।

চড়াই পথের মধ্যেও এখানে ওখানে মন্দির। কিছু দোকানপাট বসেছে। দেবতারা পাথর গড়িয়ে নিচের দৈত্যদের পিষে মেরে ফেলত নাকি এখানে বসে। পিষে মেরে ফেলার জন্য এই পাহাড়ের নাম হয়েছে পিসু। পিচ্ছিল বলে আবার পিসু নাম হয়নি তো?

কিছুটা ঘোড়ায় চেপে আর কিছুটা পায়ে হেঁটে একসময় পিসুটপে পৌঁছে গেলাম। একেবারে আকাশের চন্দ্রাতপের নিচে। প্রায়-সমতল একটি উপত্যকা পাওয়া গেল সেখানে। এই সেই পিসু টপ যা কিনা স্বাধীনতার সাত-আট বছর আগে পণ্ডিত নেহরু অতিক্রম করতে পারেন নি? আমরা পেরেছি। অশ্বারোহণে হলেও আমরা পেরেছি।

আরো আগে অমরনাথ দর্শনে স্বামী অভেদানন্দজি এখানে এসেছিলেন। অনেক দেবদারু, (দ্রা'খ' এবং ভূর্জ গাছ দেখেছিলেন। সেই সবুজ পরিবেশ আর বিশেষ নেই। একটু ন্যাড়ান্যাড়া লাগছে জায়গাটা। বছর বছর এত তীর্থযাত্রীর ধকল সইতে পারে মূক নিসর্গপ্রকৃতি? অনেক মানুষের যাতায়াত মানে অনেক আবর্জনা এবং ধ্বংস। প্রকৃতির অনাবিল সাম্রাজ্যে মানুষের দানবীয় উৎপাত।

পাহাড়ের উপরে ভাণ্ডারা খোলা হয়েছে ইতিমধ্যে। বিনামূল্যে তীর্থযাত্রীদের সেবার আয়োজন করেছে সেবাসমিতিরা। একাজে এগিয়ে এসেছে নানাদেশের নানা ধার্মিক প্রতিষ্ঠান। দিল্লি পাঞ্জাব হরিয়ানা এবং অন্যান্য জায়গা থেকে এসেছেন এরা। দুর্গম পথে সাহসী যাত্রীদের সেবা করাই এদের পুণ্যার্জনের পথ। মানবসেবা।

আমি আর শাশ্বতী উপরে পৌঁছে অপে'খ'া করছি ডাণ্ডিদের জন্যে। আগে যাত্রা শুরু করলেও আমরা ওদের ডিঙিয়ে চলে এসেছি অনেক'খ'ণ। ওরা না এসে পড়লে আমরা এগোতে পারছি না। বিশেষ করে ভারতীর জন্যে চিন্তা হচ্ছে খুব। হাত-ভাঙা অবস্থায় ওর কোন সমস্যা হচ্ছে কি না তা না জেনে আরো এগোই কী করে?

আমাদের ঘোড়াওয়ালারা সেসব শুনতে নারাজ। ওরা বারবার তাগাদা দিচ্ছে।

— চলিয়ে। বাদল আ সেকতা।

ঘোড়াওয়ালাদের বললাম — শুনো মাইজিদের রওনা না করিয়ে এখান থেকে যাব না। অপে'খ'া করতেই হবে।

একটু পরে একে একে সবকটা ডাণ্ডিই এসে হাজির হল। ডাণ্ডি থেকে নেমে পড়ল পিঠ সোজা করার জন্যে।

ভারতী বলল — গরম চা পেলে হয়।

লঙরখানা থেকে চা এনে দিলাম। আমরাও খেলাম। ভারতীকে জিজ্ঞেস করলাম — কোন অসুবিধে হচ্ছে কি ? এখনো ফিরে যাওয়া যায় কিন্তু।

— না না এমনি ঠিক আছি। ডাণ্ডির মধ্যে হাতপা মুড়ে গুজিমুজি হয়ে বসে থাকাটাই কষ্টকর।

— দেখ আরো দুদিন লাগবে পৌঁছতে। পারবে তো?

— না না পারব। দৃঢ় প্রত্যয় ওর কণ্ঠে।

— পথে ডাণ্ডি থেকে নামতে হয়েছিল?

— বারকয়েক। বাপরে কী ভীষণ চড়াই। রীতিমতো ভয় করছিল। একটু উঠেই বসে পড়ছিল ডাণ্ডিওয়ালারা। হাঁপাচ্ছিল খুব। এর থেকে পায়ে হাঁটা কম ভয়ের। যা সরু পেছল রাস্তা।

ডাণ্ডিওয়ালারা বিশ্রাম নিল। চা খাওয়ার জন্যে পয়সা চাইল। ওদের বিশ টাকা দেওয়া হল। বিনে পয়সায় ভাণ্ডারার চা তীর্থযাত্রীদের জন্যে, ওদের জন্যে নয়। ওরা পয়সা দিয়ে ওদের নিজেদের চেনাজানা দোকান থেকে চা কিনে খেল। এতবড়ো ভারী বোঝা বহন করা কষ্টকর তো বটেই। আমরা আমাদের দেহখানিই বহন করে তুলতে পারছি না। তার উপর ওই রকম গুরুভার। তবে ওরা পাহাড়িয়া মানুষ। এরকম বন্ধুর পথে চলতে অভ্যস্ত।

পিসুটপ থেকে জোজিবাল চার কিলোমিটার দূরে। কেউ কেউ একে যোজিপাল বা যাগিপাল বলে। প্রায় সমতল পথ। বড়ো বড়ো গাছপালা নেই আর তেমন করে। পার্বত্য প্রদেশে উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে গাছপালা-অরণ্যের চরিত্র বদলে যায়। পশুপাখি-কীট-পতঙ্গ অন্যরকম হতে থাকে। মানুষও আর একধরণের থাকে না। চন্দনবাড়ি থেকে কতটা পথ এলাম?

জানা গেল, এখান থেকে সোনাসার হ্রদে যাওয়া যায়। পাঁচ কিলোমিটার দূরে। বেশ খানিকটা চড়াই ভেঙে যেতে হবে কয়েক মাইল দূরের সোনাসার গিরিবর্ত্মে। সেসব চড়াই-উৎরাই আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে।

আপাতত আরো দু'কিলোমিটার যেতে পারলে পড়বে নাগাকোটি। পথে পড়বে পাতালগ্রাড, ব্রজলকোট, জাজিপারাও এবং কুট্টিঘাটি। শঙ্কু মহারাজের ভ্রমণকাহিনী অনুসারে নামগুলো জানা হয়েছিল। হয়তো পথে সেসব যথাসময়ে পড়েছিল। আমরা চলতে চলতে তার হদিশ করতে পারিনি।

মাঝেমধ্যে সুন্দরী ঝর্ণা পথ জুড়ে দাঁড়াচ্ছে। পাহাড়ের কোন গহ্বর থেকে উৎসারিত হয়ে পাথরে পাথরে জলতরঙ্গ বাজিয়ে চলেছে। সবুজ প্রান্তরের মধ্য দিয়ে চপল পায়ে মুখর। নিম্নগামী। তার হিমশীতল মিষ্টি জল। মিঠে রোদে ঝিকমিক করছে। পাহাড়ীয়া ঝর্ণার জলপান করা আমাদের মতো পেটরোগা শহুরেদের পে(সমীচীন কিনা ভাবতে হয়। অনেকেই অবশ্য ঝর্ণার জলপান করছে নির্দ্বিধায়। যার যেমন সয়।

ঘোড়ায় চড়ে হেলতে দুলতে যাচ্ছি বটে তবে এক একবার ভীষণ সরু পথ সামনে আসছে। অমন সঙ্কীর্ণ পথে পায়ে হেঁটে চলাই যথাযথ। ঘোড়া তখন উঁচু দিয়ে অন্য পাহাড়ী পথে এগিয়ে গিয়েছে।

এক একবার ভারী চড়াই ভাঙতে হচ্ছে। শাশ্বতীর দেখছি পায়ে হেঁটে ওই পথ ধরে চলতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। হাত ধরে টেনে তুলতে হল বারকয়েক। বারবার বলছিল — পিসেমশাই আপনি না থাকলে খুব মুস্কিল হত!

— কিছুই হত না। কারো জন্যে কোন কিছু থেমে থাকে না। কিছু একটা ঠিক হয়ে যায়। তোমারও হয়ে যেত। ওসব নিয়ে ভেব না। মনে মনে অবশ্য এই বয়সেও নিজেকে অনেক সাবলীল ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছি।

ভারতীদেরও নাগাকোটিতে পায়ে হেঁটে যেতে হয়েছে খানিকটা রাস্তা। সকলকেই নামতে হয় এখানে। শুধু এখানে কেন, পথে নানা দুর্গম জায়গায় নেমে পায়ে হেঁটে যেতে হয়। নাগাকোটি থেকে শেষনাগ আর মাত্র তিন কিলোমিটার। সব মিলিয়ে চন্দনবাড়ি থেকে বারো কিলোমিটার দূরে।

শেষনাগ একটি হ্রদ। ৩৩৫২ মিটার অর্থাৎ ১১,০০০ ফুট উচ্চতায় তার অবস্থান। আমাদের প্রথম দিনের যাত্রা ওখানে সাঙ্গ হবে। এপথে সকলের প্রথম যাত্রাবিরতি শেষনাগেই হয়।

কাশ্মীরে অনেক জায়গার নাম দেখেছি এই নাগ-সম্বলিত। অনন্তনাগ-কোকরনাগ-ভেরিনাগ। বলা হয় এদেশে কাশ্যপ ঋষি নাগদের প্রতিষ্ঠা করে যান বলে এত নাগের আধিক্য। সর্পকুল যে নাগ এরা সেই নাগ বংশ? নাকি মানবপ্রজাতির এক জনজাতি নাগ হিসেবে চিহ্নিত? নাগ স্রেফ টোটেম চিহ্ন তাদের। আবার এদেশে নাগ কথার একটি অর্থ হল সরোবর। উপত্যকায় একদা অনেক সরোবর ছিল বলে এদের নামের শেষে এত নাগ, এমনও হতে পারে।

আমাদের উদ্দিষ্ট ল'খ্য সেই শেষনাগ। একদিকে এটি একটি পর্বতের নাম। সাত মাথাওয়ালা শিখরদেশের জন্যে। নাগ-সদৃশ তার রূপ। তাই এই নামকরণ। পর্বতের নিচে গাঢ় নীল জলের যে হ্রদটি রয়েছে তার নামও শেষনাগ। পুরাণমতে আদিদেব শঙ্কর অমরনাথ যাত্রাকালে এই স্থানে তাঁর অঙ্গভূষণে যে সর্প ছিল সেটা ত্যাগ করে সম্মুখে অগ্রসর হয়েছিলেন।

আমরা সন্ধ্যার একটু আগে শেষনাগ পৌঁছে গেলাম।

কী দারুণ শান্ত নীল জল — গাঢ় তুঁতে রঙের। নিস্তরঙ্গ কাচের মতো মসৃণ। চলার পথ থেকে ডানহাতে অনেকটা নিচে তার অবস্থান। চারদিক পাহাড়ে দিয়ে ঘেরা। বিপরীত দিকে মানে পূর্বদিকে হিমবাহ জাতীয় কিছু একটা আছে বলে মনে হচ্ছে। হিমবাহের গলিত বারি থেকে হ্রদের জলের উদ্ভব। এখান থেকেই লিডার নদী উৎপন্ন হয়েছে? অবশ্য যদি কোলাহাই হিমবাহ থেকে জাত নদীকেই লিডার বলা হয় তবে শেষনাগ থেকে উৎসারিত এই স্রোতধারাটিকে শেষনাগ বলা সঙ্গত। কোলাহাই হিমবাহ পহেলগাঁও থেকে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরে। যেতে হয় আরু-লিডারওয়েট হয়ে। ৫৪৩৭ মিটার বা ১৭,৮০০ ফুট উচ্চতায়।

ধর্মস্থানের সঙ্গে জড়িত কাহিনীর শেষ নেই। শেষনাগেরও কাহিনী আছে। জনপ্রবাদ — সুশ্রবস নামের জনৈক নাগ এই হ্রদটি খনন করেছিল। সেই মহানাগ নাকি আজো এই হ্রদের জলে বাস করছে। সম্বৎসরে নির্দিষ্ট কোন সময় জল থেকে সে উত্থিত হয়। কবে? অমরনাথ ছড়িযাত্রার সময় এখানে হ্রদের পাশে ছড়ি নামানো হয়। তখন হ্রদের তীরে বসে শেষনাগের পূজার্চনা করা হয়। তারপর শেষনাগের ভোজনের ব্যবস্থা করা হয় — দুধকলা জাতীয় খাদ্যদ্রব্য দিয়ে। হ্রদ থেকে তখন পঞ্চমুখী শ্বেতকায় শেষনাগ জলরাশি মথিত করে তীরে উঠে আসে। খাদ্য গ্রহণ করে আবার হ্রদের জলে অন্তর্হিত হয়ে যায়। বছরে একবার।

কে যেন বলেছিল শেষনাগে বসে — আমাদের অনীতা নাকি সেই নাগ দর্শন করেছিল। মনে হচ্ছে কেউ ওর নামে এই সব কথা রটনা করে স্রেফ খানিকটা মজা করছে। কে বলেছে তা আর মনে নেই।

পশ্চিম তীর ধরে অর্ধবৃত্তকার পথে হ্রদ এলাকা পার হয়ে আরো খানিকটা উত্তরে এগিয়ে পাওয়া গেল একটি উপত্যকা। তীর্থযাত্রীদের রাতের বিশ্রামের জন্যে আস্তানা বসানো হয়েছে সেখানে। সার সার তাবু পড়েছে। সরকারী এবং বেসরকারী। ভাণ্ডারাও বসেছে অনেক। যাত্রীদের বিনামূল্যে সেবা বিতরণের জন্য। তারা মাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে যাত্রীদের। কোথাও কোথাও দেখছি তখনো লঙরখানা চালু হয়নি। আয়োজনপর্ব চলছে।

এই জায়গার আরেক নাম বায়ুযান। স্থানীয়রা বলে ওয়াবযান। প্রবল বায়ুপ্রবাহের জন্যে এই নাম হয়েছে নিশ্চয়ই। আমরা অবশ্য তেমন কিছু পেলাম না। পৃথিবী এখানে শান্তসুন্দর। জগত শান্তশীতল হয়ে আছে। তীর্থযাত্রীদের মনও প্রশান্ত। সুন্দর প্রকৃতি মাতৃসমা স্নেহে আপ্লুত করে রেখেছে। বায়ুযানের নামের পিছনেও এক গল্প আছে। শঙ্কু মহারাজের ভ্রমণ কাহিনীতে তার উল্লেখ দেখেছি।

পথের দুধারে সার সার তাবু পড়েছে। খুঁজেপেতে আমরা রসিদ ভায়ের 'হোলি কেভ' তাবুতে পৌঁছলাম। রাস্তা থেকে একটু বাঁদিকে ঢুকে কয়েকটা তাবুর পিছনে।

এক একটা তাবুতে আটখানা করে ক্যাম্পখাট পাতা হয়েছে। একেবারে গায়ে গায়ে লাগিয়ে। পা ফেলার জায়গা মেলে না মোটে।

একটা তাবুতে প্রিয়-তাপি, রুমা, অনীতা-কবিতা-বিপাশা এবং দেবদ্যুতিরা রয়েছে। পাশেই আরেকটা তাবু ফেলা হয়েছে বাকিদের জন্যে। পিছন দিকে অন্য তাবুতে রান্নার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রিয়-তাপিরা আমাদের জন্যে চিন্তা করছিল শেষনাগে পৌঁছে। অনেকেই ভাবছিল — আমরা চন্দনবাড়ি থেকে গেলাম কিনা। অমরনাথ যাত্রা করতে পারলুম কিনা। দল থেকে একজন যাত্রী ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে চলে গেলে, অন্য সকলেরই কষ্ট হয়। শেষ পর্যন্ত যে আমরা যাত্রা করতে পেরেছি এবং শেষনাগে এসে সকলের সঙ্গে মিলিত হতে পেরেছি, তা জেনে সকলেই খুব খুশি।

তাবু থেকে বেরিয়ে মূল পথের উপর অপে'খা' করতে লাগলাম। শাশ্বতীর মা এবং সবিতার ডাণ্ডি এল প্রথমে। একটু পরে ভারতীর ডাণ্ডিও এসে পৌঁছল। সকলে খুশিতে চিৎকার করে উঠল — পিসিমণি আপনি এসে গিয়েছেন? ওহ, আমাদের খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। আগে এখানে এসে বসুন।

তাবুর মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। হৈচৈ করে ওরা ভারতীকে জায়গা করে দিল একেবারে সামনের ক্যাম্পখাটে। তাপি রুমা পিসিমণির যত্ন করতে লেগে গেল। বিছানায় তুলে শুয়ে পড়তে সাহায্য করল। গরমজামা খুলে দিল। পানীয় জল এগিয়ে দিল। চা নিয়ে এল।

— কি হয়েছিল বলুন তো? সকলের একই প্রশ্ন ।

— দাঁড়া দাঁড়া একটু জিরিয়ে নিতে দে তারপর শুনবি। তাপি তার পিসিমণিকে আগলায়।

ওদের সকলকে সব ঘটনা খুলে বলা হল। ঘটনা তো নয় দুর্ঘটনা। সকলের সুচিন্তিত অভিমত — বাবা অমরনাথ আপনাকেই আসলে টেনেছেন। প্রথমে কোন কারণে একটু রেগে গিয়েছিলেন — এই তোর আমার কাছে আসার দরকার নেই। সেজন্যে হাতভাঙার শাস্তি দিলেন। তারপর মনে দয়াটয়া হল বোধ হয়। তখন বললেন — ঠিক হ্যায়, আও লেড়কি, মেরে পাস আও।

প্রিয় ডাক্তারি করতে উঠে বসল। বলল — দেখি পিসিমা কোথায় লেগেছে আপনার? ডানহাতে?

হাত ধরে নেড়েচেড়ে টিপে টিপে দেখেশুনে বলল — কবজির হাড়ে লেগেছে তবে ভাঙেনি বলেই মনে হচ্ছে। এই ব্যাণ্ডেজে হবে না। বুঝেছেন তো? ক্রেপ ব্যাণ্ডেজ আছে? নেই! এই তোদের কারো কাছে ক্রেপ ব্যাণ্ডেজ আছে? দে তো।

ব্যাণ্ডেজ জোগাড় করে নিজের হাতে যত্ন করে বেঁধে দিল ডানহাতের কবজি। ভারতী বলল — হ্যাঁ বেশ আরাম লাগছে এখন। হাতটা এর্তখ'ণ ভারী লাগছিল খুব।

কয়েক বড়ি ওষুধ দিল। বলল — ব্যথা বেশি অসহ্য মনে হলে খাবেন। মুড়িমুরখির মতো ট্যাবলেট খাবেন না যেন।

বারো কিলোমিটার পাহাড়ি পথ চলার জন্য পরিশ্রম হল প্রচুর। কিন্তু কী আশ্চর্য মোটেই খিদে পাচ্ছে না। সারা পথে খেয়েছি শুধু বাদাম-আখরোট-কিসমিস। বাড়ি থেকে ছোট ছোট প্যাকেট করে নিয়ে আসা হয়েছিল। পথের মধ্যে যেখানে পেয়েছি, চা খেয়েছি। ব্যস আর কিছু নয়। মনে হয়েছিল শেষনাগে পৌঁছে কিছু খাওয়া যাবে। অশোক বলে দিয়েছিল অবশ্যই ভাণ্ডারায় খেতে। অন্তত সেখানে কিছু খাদ্য চেখে দেখতেই হবে। কিন্তু এখন একেবারে ইচ্ছেই হচ্ছে না। ভারতীরও এক অবস্থা।

শরীর কিরকম গুলিয়ে উঠছে। মাথাটাও একটু ভারী ভারী লাগছে। একে হাইট সিকনেস বলে? হবেও বা। সঙ্গে করে হোমিওপ্যাথির একটা শিশি এনেছিলাম। কোকা-৩০। তার গোটাকয়েক গুলি মুখে পুরে নিয়েছি। ভারতীকেও দিলাম। বললাম — ঠিক আছ তো? পারবে তো বাকি পথটা যেতে?

— এখন পর্যন্ত ঠিক আছি। অত ভেব না তো, ঠিক পারব। ভারতী সান্ত্বনা দেয়। কতটা ব্যথাবেদনা লুকিয়ে রাখছে যে ও, সেটা বোঝা দায়।

তাপস ঘটক বলল — জানেন তো পিসেমশাই, পিসুটপ পার করে আমরা দুজনেও পড়ে গিয়েছিলাম।

— তাই নাকি! কি করে?

— হয়েছিল কি, পথের মধ্যে এক জায়গায় অনেক কাদা ছিল। সেখানে আমার ঘোড়া স্লিপ করে আর আমি ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যাই। পড়েছি বাঁদিকে, পাহাড়ের কোল ঘেষে। আমার পিছনে ছিল মিতালীর ঘোড়া। ওর সইস আবার করেছে কি, মিতালীর ঘোড়া ছেড়ে আমি পড়ে যাচ্ছি দেখে আমাকে ধরতে এগিয়ে আসে। আর তখন মিতালীও টাল সামলাতে না পেরে ডানদিকে মানে খাদের দিকে পড়ে গেল। কপাল ভালো যে বড়োসরো দুর্ঘটনা হয়নি কোন। কোমরে একটু লেগেছে দুজনের।

যাক তবু ভালো, বড়ো রকমের কিছু হয়নি।

রাতে যৎসামান্য আহার গ্রহণ করা সম্ভব হল। তারপর শ্রান্তি দূর করতে নিদ্রাদেবীর দ্বারস্থ হল সকলেই। সমস্ত গরম পোষাক পরে। পায়ে গরম মোজা, মাথায় মাঙ্কিক্যাপ, গায়ে উলিকট-গেঞ্জি থেকে শু(করে জামা-সোয়েটার-জ্যাকেট সব চাপিয়ে। হালকা হওয়ার কোন দৃশ্য নেই। তার উপর দুখানা করে মোটা ভারী লেপ চাপানো হয়েছে।

উঃ! যা প্রচণ্ড ঠাণ্ডা শেষনাগে।

৭। শেষনাগ থেকে পঞ্চতরণী

পাহাড়ি পথে ঘোরাফেরার প্রধান সমস্যাই হল প্রাতঃকৃত্য সারা। আর সুবিধে হল এই যে ওটার খুব বেশি প্রয়োজন হয় না। খুব বেশি না হলেও কিছু তো হয় এবং সেটা সারতেও হয়। মুক্তময়দান এ ব্যাপারে সবথেকে ভালো ব্যবস্থা। শহুরে মানুষের কাছে তা খুব অস্বস্তির বটে কিন্তু কিছু করার নেই। রথেপথে এ রকমটাই চলে। খুব ভোর ভোর অন্ধকার থাকতে থাকতে একজন দুজন করে টর্চ হাতে অন্ধকারে চলে গেল দৈনন্দিনের অপকর্মটি সারতে।

শেষনাগ থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়া দরকার। চা-জলখাবার খেয়ে ঝটপট তৈরী হচ্ছে সকলে। দ্বিতীয়দিনের যাত্রা শেষনাগ থেকে পঞ্চতরণী অবধি। আগামীকাল দর্শন।

প্রথমেই আজ মহাগুনাস গিরিবর্ত্ম অতিত্র(ম করতে হবে। পিসুটপের মতো নির্মম চড়াই নয়। তবে চড়াই তো বটে! শুনেছি ওখানে আবহাওয়া 'খ'ণে 'খ'ণে বদলে যায়। প্রায়শই মরশুম খারাপ হয়ে পড়ে। এত খারাপ যে পথঘাট অগম্য হয়ে যায়। মেঘবৃষ্টির খেলা চলে যখন তখন। একবার (বোধ করি ১৯২৮ সালে) এখানে প্রবল তুষারঝড়ের মধ্যে পড়েছিল ছড়িমিছিল। ধ্বস নেমে এসেছিল অতর্কিতে। কয়েক শ' লোকের মৃত্যু হয়েছিল সেবার।

আমাদের বন্ধু খিদিরপুরের অরুণ। ওকে আড়ালে 'হাউহাউ' বলা হয়। কয়েক বছর আগে অরুণ-হাসি মহাগুনাসে পৌঁছে নাকি প্রবল তুষারঝড়ের মধ্যে পড়েছিল। হাসি গল্প করেছিল আমাদের কাছে। সেই দুর্ধর্স মহাগুনাস পার হতে হবে। একটু ভয় ভয় করছে। এতটা উচ্চতায় আবার শ্বাসকষ্ট জাতীয় কিছু হবে নাতো। পিসুটপ জয় করেছি যখন, তখন মহাগুনাসও জয় করব।

শেষনাগ থেকে ওয়ারবাল এক কিলোমিটার। আরো ২.৬ কিলোমিটার রাস্তা পার হয়ে তবে মহাগুনাস গিরিবর্ত্ম পড়বে। ৪২৭৬ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত এই গিরিপথ। ফুটের হিসেবে ১৪,০০০ ফুট। আমাদের মতো সমতলের ভীতু অভাজনদের কাছে এই উচ্চতাই হল মাউন্ট এভারেস্ট। যদিও উচ্চতায় প্রকৃতপ'খ' মাউন্ট এভারেস্টের অর্ধেক। যাই হোক মহাগুনাসের থেকে বেশি উপরে পাহাড়-চড়া এ জনমে আর আমাদের প'খ' সাধ্য হবে না। সুতরাং এটাই হল আমাদের কাছে সর্বোচ্চ উচ্চতা যেখানে আমরা সশরীরে পৌঁছতে পারব। পৌঁছে যাব আকাশের মেঘমালার কাছে। এর জন্য শেষনাগ থেকে প্রায় আড়াই হাজার ফুট উপরে উঠতে হচ্ছে।

দ্বিতীয় দিনে পথচলা অনেকটা সহজ হয়ে উঠছে। ভারতীদের আগে রওনা করিয়ে দিয়েছি। ভারতীর সঙ্গে সঙ্গে এবার সাধনা রয়েছে। এগিয়ে রয়েছে সবিতা-রঞ্জিতাদির

ডাণ্ডি। পিসিমণিকে ছেড়ে সাধনা বেশি এগিয়ে থাকছে না। আমার এবং শাশ্বতীর ঘোড়া একটু আগে ওদের পার করে এল। বলে এসেছি – মহাগুনাসে অপে'খা করব তোমাদের জন্যে।

ওয়ারবাল কখন পার করেছি বুঝতে পারিনি। আরো কিছু সময় চলার পরে ঘোড়াচালক সৈয়দ বলল – মহাগুনাস আ গয়া।

দু'পাশে পাহাড় ঠেলে উঠেছে। তার মাঝখানে পথ চলে গিয়েছে অমরনাথের। পথনির্দেশিকা জানাচ্ছে – হ্যাঁ এটাই মহাগুনাস।

এই সেই স্থান যেখানে শঙ্কর ভগবান কনিষ্ঠপুত্র গণেশকে রেখে এগিয়ে গিয়েছিলেন। শুধু মাতা পার্বতীকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে গেলেন অমরনাথের দিকে। অতি সঙ্গোপনে অমর সৃষ্টিকথা শোনাতে হবে পার্বতীকে। গণেশের অবস্থান এখানে বলে মহাগণেশ। তা থেকে স্থাননাম হয়েছে মহাগুনাস।

এমন আকাশ-ছোঁয়া উচ্চতায় দাঁড়িয়ে বুক ভরে শ্বাস নিতে কেমন লাগবে ভেবে মরছিলাম। কই অক্সিজেনের অভাব বোধ হচ্ছে নাতো? সেরকম কিছু বুঝতেই পারছি না। জোরে জোরে শ্বাস নিয়ে মনেপ্রাণে অনুভব করতে চাইছি ১৪,০০০ ফুট উচ্চতার দাপট। এখানে দাঁড়িয়ে একটা গৌরব গৌরব ভাব বোধ হচ্ছে না মনে? হচ্ছে।

খুব ইচ্ছে ছিল এখানে একটু বসব দুজনে। এবং ছবি তুলব। আমাদের এভারেস্ট বিজয়ের ছবি। সাথিহারা হয়ে পড়েছি। সহধর্মিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে সব ইচ্ছে মাঠে মারা যাচ্ছে। পথচলার আনন্দটাই মাটি। কন্যাসমা শাশ্বতীকে সেসব বলা যায়া। বৃদ্ধের প্রেম নিকষিত হেম হলেও না।

আশ্চর্য হলাম এতটা উপরে উঠে এসেছি অথচ তেমন বরফ নেই কোথাও। দু'পাশে দুটি ন্যাড়া পাহাড়। সবুজের স্পর্শ নেই তার কঠিন লাবণ্যে। আছে, পাহাড়ের ঢালে ঢালে সামান্য বরফ। বিবর্ণ হয়ে পড়ে আছে। কয়েকজন যুবক পাগলের মতো সেখানেই ছুটোছুটি করছে। ওরা এমন করছে যেন এই প্রথম বরফ দেখতে পেল।

চারদিকটা শুকনো খটখটে। বড্ডো রু'খখ' পাথুরে চালচিত্র। প্রকৃতির ধূসর ক্যানভাস দিগন্ত বিস্তৃত। বৃষ্টি নেই। মেঘ নেই। প্রবল ঝড়ঝঞ্ঝা কিছুই তো নেই এখানে। একটু হতাশ হলাম কী? যেন সেসব দুর্বিপাক একটু-আধটু থাকলেই ভালো হত। না থাকার ফলে মহাগুনাস যাত্রাপর্ব কেমন ম্যাড়ম্যাড়ে প্রাণহীন হয়ে গেল। কোন রোমাঞ্চ নেই।

মহাগুনাসে পর্যন্ত একদল সেনা প্রহরার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। হাত নেড়ে বলল তারা সকলে – বোম ভোলে।

যাত্রীরাও বলে প্রত্যুত্তরে – বোম ভোলে।

এখানে ফার্স্ট এডের ব্যবস্থা আছে। বিশেষ করে যাত্রীদের শ্বাসকষ্টের সম্ভাবনা আছে খুব। মনে হল ডাক্তারবদ্যিও আছে। দুচারজন স্থানীয় লোকজন দোকানপাট খুলে

বসেছে। মহাগুনাস থেকে একটি স্রোতস্বিনী বেরিয়ে শেষনাগে গিয়ে পড়েছে। আরেকটি স্রোতধারা আমাদের যাত্রাপথের সঙ্গী হয়ে যাবে। আমরা তাকে অনুসরণ করে চলতে চলতে পঞ্চতরণী পৌঁছে যাব।

আমরা ঘোড়ায় বা ডাণ্ডিতে করে চলেছি। কাতারে কাতারে মানুষ পায়ে হেঁটে চলেছে। আবালবৃদ্ধবণিতা। রোগাভোগা মানুষ থেকে মোটাসোটা। সাধু সন্ন্যাসী গৃহী কে নয়! বাচ্চা ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত পদাতিক। পাহাড়ি পথে পায়ে চলা একদিক থেকে নিরাপদ বেশি। তাছাড়া দেবতার কাছে পদব্রজে পৌঁছনোই বোধহয় রীতি। কষ্ট না করলে দেবতা প্রসন্ন হন না। ভক্তের ঐকান্তিক আগ্রহ প্রতিপন্ন হয় না।

এই পদাতিক বাহিনী দেখে একটু লজ্জাবোধও হচ্ছিল। আমরা শহুরে মানুষরা দৈহিক শক্তিতে দুর্বল। তার মধ্যে বঙ্গবাসীরা বিশেষ করে দুর্বলতর। এক অ'খ'মতা মানুষ ঢেকে রাখে অন্য কিছু দিয়ে। বুদ্ধি এবং অর্থবল দিয়ে। জগতে সকলের 'খ'মতা সমান নয়। যার যেমন 'খ'মতা, সে তার বলেই জীবনযাপন করে।

মহাগুনাস থেকে সামান্য (৪০০ মিটার) দূরে পাবিবাল। তারপর আরো এক কিলোমিটার গেলে পড়ছে পোষপাথারি। পুষ্পত্রী থেকে নাম হয়েছে পোষপাথারি। উচ্চতা ৪,১১৪ মিটার (১৩,৫০০ ফুট)। মহাগুনাস থেকে মাত্র পাঁচশ' ফুট নিচে। পুষ্পত্রীতে নানা রকমের পুষ্প থাকার কথা। নেই তো সেরকম কিছু।

সারাটা পথ জুড়ে নানা বর্ণের পাহাড় বিরাজ করছে। সবুজের চিহ্(সামান্যই। রূপোলী ঝর্ণা আছে। ঝকঝকে আকাশ আছে। শীতের সঙ্গে রোদের ঘনিষ্ঠ মেলামেশা আছে। মাঝে মাঝে মেঘের আনাগোনা বিচিত্র আলপনা আঁকছে আকাশে। ঝিরঝির করে নামা হঠাৎ খানিকটা ইলশেগুড়ি বৃষ্টি হয়ে গেল। তেমন করে না ভিজিয়ে এমন আদুরে বৃষ্টিও হয়! যেন দেবতার আশীর্বাদ!

বড়ো চত্বর জুড়ে বেশ কয়েকটি দোকান বসেছে। ক্লান্ত যাত্রীদের সমাদরে বসানোর জন্যে চেয়ার পাতা রয়েছে। মিলিটারি আস্তানা অদূরে। পাহাড়ে পাহাড়ে তাদের সারাদিন ধরে বসে থাকা। পাহারা দেওয়া। সবই 'আমাদের জন্যে'।

এখানেই দেখা হল প্রিয়দের সঙ্গে। ওদের চা খাওয়া শেষ হয়ে গেলে কালবিলম্ব না করে এগিয়ে গেল প্রিয়-তাপি-রুমা-কবিতা-দেবদ্যুতির দল। তারপর অরুণপাত্র-তাপসঘটকদের দল। অনীতার ডাণ্ডি কখন কেমন করে চলল তার হদিশ করতে পারিনি।

আমি আর শাশ্বতী অপে'খা করছি পিছিয়ে পড়া ডাণ্ডিদের জন্যে। আমরা ওদের যাত্রা শুরু করিয়ে দিই। তারপর ওদের ফেলে এগিয়ে চলে যাই। কিছুদূর গিয়ে আবার অপে'খা করি। অপে'খা না করে পারব কেন!

বসে আছি। একটু পরে এসে পড়ল একে একে।

চেয়ারে বসে জুত করে চা খাওয়া হল।

এই দীর্ঘ উন্নত নগাধিরাজ হিমালয় একদা নাকি ধরিত্রীতে ছিলই না। ছিল সমুদ্রগর্ভে নিহিত। এ কথা কি সত্যি? হ্যাঁ, কঠিন নীরস বৈজ্ঞানিক সত্য। সে সব পুরাণের গল্পকাহিনী নয়। নীরস বললাম বটে কিন্তু তা তো সত্যি নয়। আমি যে তার মধ্যে প্রভূত রস পাই। সাধারণ মানুষ পায় না বলেই নীরস বলা যায় হয়তো।

ভূতত্ত্ব যাকে জিওলজি বলা হয়, তারা বলছে – অতীতে এখানে একদা ছিল টেথিস নামের এক প্রাচীন মহাসাগর। তারই অন্তিম স্মরণচিহ্(বর্তমানের ভূমধ্যসাগর। বিশ কোটি বছর আগে। নাকি আরো আগেকার কথা সেসব। টেথিসের দখিনে গণ্ডোয়ানা প্লে-ট ভারতবর্ষের দাখিণাত্য অঞ্চল বুকে করে বহন করছে। পাহাড়-পর্বত-নদী-মালভূমি নিয়ে। এও এক নতুন কথা। পৃথিবীর উপরিতলের খানকতক প্লেট বহন করে চলেছে সমগ্র মহাদেশ-মহাসাগর। অনেকটা ভাঙা ভাঙা দুধের সরের উপর পিঁপড়ের চলাফেরার মতো। এরকমটাই নাকি পৃথিবীর উপরিতলের ধরণধারণ। মহাদেশ-মহাসাগর নিয়ে এই সকল প্লেট ভেসে বেড়াচ্ছে পৃথিবী নামক গোলকের উপরতলে। বিশাল প্রশান্ত মহাসাগরটি পর্যন্ত রয়েছে একটি আস্ত প্লেটের উপর। প্লেট-টেকটনিক্স তত্ত্বমতে।

সেই গণ্ডোয়ানা প্লেট নিচের তরল-প্রায় ভূস্তরের উপরে ভাসতে ভাসতে উত্তরের দিকে এগোতে থাকে। উত্তরে রয়েছে সাইবেরিয়ার প্লেট। সেখানে ধাক্কা দিতে থাকে। সেই দুই প্লেটের ধাক্কায় টেথিসের গর্ভ থেকে জেগে ওঠে সমুদ্রতল। কয়েক কোটি বছর আগে। নিচের শিলা ভাঁজ খেয়ে খেয়ে উঁচু হতে থাকে। গঠন করে নবীনতম পর্বতমালা হিমালয়। আজো তার গঠনপর্ব শেষ হয়নি। হিমালয় নাকি আরো উঁচু হচ্ছে।

এই সেই হিমালয়। সমুদ্রতলদেশের পাললিক শিলা নিয়ে, সমুদ্রজাত জীবাশ্ম দিয়ে গড়া। আজো গণ্ডোয়ানা প্লেট উত্তরমুখী। তার ফলে সমগ্র হিমালয় অত্যন্ত ভূকম্পনশীল এলাকা বলে চিহ্নি(ত। কিছুদিন আগে প্রজাতন্ত্র দিবসে গুজরাতের ভুজ এলাকা কেন্দ্র করে যে ভূকম্প হয়েছে তা এই প্লেটের চাপ সইতে গিয়ে সামান্য নড়াচড়া থেকে জাত।

শেষনাগ থেকে মহাগুনাস পাস হয়ে পঞ্চতরণী মোট বারো কিলোমিটার পথ। আরো ছয় কিলোমিটার দূরে আমাদের ল'খ্যস্থল অমরনাথ গুহা। পথ এখান থেকে ক্রমশ নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। নদীর বেলাতটে।

একটু পরে উঁচু পাহাড় থেকেই পঞ্চতরণীর দেখা মিলল। অনেকটা দূর থেকে। বালুকাময় প্রশস্ত উপত্যকা। তার মাঝখান দিয়ে জলস্রোত বয়ে চলেছে। প্রায় পৌঁছে গিয়েছি ল'খ্য। সেই আনন্দে উৎসাহিত হয়ে হৌস হৌস করতে করতে নিচে নামছি দ্রুত বেগে।

পঞ্চতরণীতে পাঁচটি স্রোত এসে মিলেছে। এদের আলাদা নামও আছে – ভীমা, ভগবতী, সরস্বতী, ঢাকা এবং বর্গশিখা। পাঁচটি স্রোতধারা প্রবাহিত বলে এর নাম পঞ্চ

তরণী। এখন অবশ্য পাঁচটি স্রোতধারা চিনে নেওয়ার মতো জলধারা নেই। শীর্ণকায় নদী সামনে। মিলিত হয়েছে অমরনাথের চরণধৌত করে চলা স্রোত অমরগঙ্গার সঙ্গে। সেখান থেকে কোথায়? আরো কিছু স্রোতস্বিনীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে অবশেষে বিতস্তায় মানে ঝিলমে?

সাঁকো পেরিয়ে যেতে হবে নদীর ওপারে। নদীর ডানতীরের উপত্যকায়। বাঁদিকে নদী আর ডানদিকে উঠে গিয়েছে পাহাড়। সবুজ আস্তরণে মোড়া। নদীর ওপারেও পাহাড়। পিছনে পাহাড়। পাহাড়ের রাজ্যে আর কি পাওয়া যাবে পাহাড় ছাড়া? কোন কোন শিখরে বরফ রয়েছে অল্পস্বল্প। বরফের রাজ্য নেই। কালো পাথরের প্রে'খ'াপটে তুষারশুভ্র ঝলকানি চোখে লেগে থাকে। নীল আকাশ উজ্জ্বল রোদে হাসছে।

৩,৬৫৭ মিটার উচ্চতায় বিরাজ করছে পঞ্চতরণী। ১০,৭০০ ফুট। রাস্তার বাঁদিকে সামান্য ঢালে নেমে আমাদের তাবু। চার সারিতে সাজানো। একেবারে নদীর তীর বরাবর। আজ আর তেমন পথকষ্ট অনুভব করিনি।

অবশেষে পঞ্চতরণী পর্যন্ত পৌঁছে গেলাম! সত্যি পৌঁছে গেলাম তো? সেই ভীতিপ্রদ পিসুটপ মহাগুনাস পার হয়ে? দু'দফায় চব্বিশ কিলোমিটার চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে? আর সামান্য দূরে পবিত্র গুহা। অপে'খ'া করছি ডাণ্ডিদের জন্যে।

শঙ্কর ভগবান অমরনাথ যাত্রাকালে এখানে কি কিছু ত্যাগ করে গিয়েছিলেন যেমন করেছেন পহেলগাঁও, চন্দনবাড়ি, শেষনাগ এবং মহাগুনাসে? পুরাণ বলছে, তিনি এই দুর্গম স্থানে পঞ্চভূত বর্জন করে গিয়েছিলেন। পঞ্চভূত মানে ি'খ'তি অপ তেজ ম(ৎ এবং ব্যোম। সাদা কথায় মাটি জল শক্তি বায়ু এবং আকাশ।

প্রাচীন মতে জগত নির্মিত এই পঞ্চভূত দিয়ে। আধুনিক বিজ্ঞানে বলে জগত নির্মিত বিরানব্বুই রকমের পরমাণু দিয়ে। সকল জড় ও জীব ঐ বিরানব্বুই ধরণের পরমাণুর সাহায্যে সৃষ্ট হয়েছে। আরো সূ'খখ'ভাবে বলতে গেলে বলা উচিৎ তিন রকমের পারমাণবিক কণা দিয়ে নির্মিত – ইলেকট্রন, প্রোটন এবং নিউট্রন। প্রাচীন মতে এবং বিজ্ঞান মতে এখানে দ্বন্দ্ব। কে সত্য? কার কথা বেশি গ্রহণযোগ্য? কার হাতে প্রমাণ আছে? সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। যুগযুগান্ত ধরে প্রচলিত বিশ্বাস ঝপ করে ফেলে দেওয়া সহজ কথা নয়। আবার যুক্তিবাদী প্রমাণসমৃদ্ধ বিজ্ঞানকেও অস্বীকার করা যায় না।

প্রাচীন প্রথা মতো পঞ্চতরণীতে অমরনাথ যাত্রীরা পরিধেয় বস্ত্র ত্যাগ করে পঞ্চতরণীর স্নিগ্ধজলে স্নান করবে। তারপর ভূর্জপত্র পরিধান করে অমরনাথ দর্শনে যাবে। স্বামী বিবেকানন্দ নাকি সেই প্রথা পালন করেছিলেন। ভূর্জপত্র পরে অমরনাথ দর্শনে গিয়েছিলেন। আমরা ওই প্রাচীন প্রথা পালন করছি না। দেখছি না, অন্য কাউকেও তা

পালন করতে। আজকাল জনগণ প্রাচীন ভাবনার কিছুটা গ্রহণ করে কিছুটা বর্জন করে। গ্রহণ করে যতটা যুগোপযোগী এবং পালনযোগ্য বলে মনে করা হয়। এও এক সমঝোতা আপোষ। না করে উপায় নেই।

কথা ছিল আজ দ্বিতীয় দিনের যাত্রা বিরতি হবে পঞ্চতরণীতে। আগামীকাল অর্থাৎ তৃতীয় দিন অমরনাথ দর্শনে যাত্রা করা হবে। ফিরে এসে রাতে এখানেই আবার বিশ্রাম নেওয়া। চতুর্থদিনে প্রত্যাবর্তন সম্ভব হলে একেবারে সোজা চন্দনবাড়ি-পহেলগাঁও। নয়তো শেষনাগ।

প্রিয় ইতিমধ্যে ঠিক করে ফেলেছে ওরা আজই অমরনাথ দর্শন করতে যাত্রা করবে। চমৎকার আবহাওয়া রয়েছে। হাতে সময় আছে অঢেল। যাতায়াত নিয়ে বারো কিলোমিটার সেরে ফেলা যাবে তার মধ্যে। আসল দুশ্চিন্তা মরশুম নিয়ে। আগামীকাল কিরকম মরশুম পাওয়া যাবে তার স্থিরতা নেই। আজ ভালো দেখছি কাল মন্দ হতে পারে। তার থেকে পড়ে পাওয়া সুযোগটা কাজে লাগানোই ভালো। শুভস্য শীঘ্রম।

সন্তসিং হয়ে যেতে হবে অমরনাথ গুহায়। পঞ্চতরণী থেকে ছয় কিলোমিটার পথ। অমরনাথ গুহা ৩,৯৫২ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। ফুটের হিসেবে ১৩,০০০ ফুট। পর্যটন দপ্তরের পুস্তিকা মতে। মোট কথা আবার চড়াই ভাঙতে হবে। এবং প্রায় তেরোশ' ফুট চড়াই।

কবিতা আর বিপাশা সবার আগে বেরিয়ে পড়ল। প্রিয়-তাপি-রুমা-দেবদ্যুতি ওদের অনুসরণ করল অনতিবিলম্বে। ওরা আজই তুষারলিঙ্গ দর্শন করতে মন করেছে।

বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত মতে সেদিন ৪ঠা জুলাই আষাঢ়ী পূর্ণিমা পড়েছে। অন্যমতে অবশ্য পূর্ণিমা আগামীকাল ৫ই জুলাই। রামকৃষ(মঠের এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল ট্রেনে। উনি তখন প্রিয়কে বলেছিলেন — ৪ঠা জুলাই হচ্ছে প্রকৃত পূর্ণিমা।

যাওয়ার আগে প্রিয় বলে গেল — পিসেমশাই, আপনারাও পারলে আজই দর্শন করে নিন। ওয়েদার খুব ভালো আজকে দেখছেন তো। কাল কেমন থাকবে কে জানে! আর সাধনাকে বলবেন, আমরা চললাম। ও যেন যে দল পাবে, তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে। যাচ্ছি তাহলে। জয় বাবা অমরনাথ।

ওরা একে একে বেরিয়ে গেল। আমাকে আর শাশ্বতীকে অপে'খ'া করতে হবে। শাশ্বতীকে বললাম — ওরা যদি এসে পড়ে তবে আমরাও আজ দর্শন সেরে নেব। কি বল?

শাশ্বতী নিশ্চিন্ত হয়ে বলতে পারছে না যে আজই দর্শন সেরে ফেলা যাক। বলল — দেখি ওরা আসুক আগে। শুদ্ধ-অশুদ্ধ বিচার-আচার কি আছে না আছে আমি সবটা ঠিকঠিক জানি না। এদের অনেক ফ্যাচাং। তিথি-ন'খ'ত্র নিয়ে অনেক ঝামেলা। বুঝতে পারছি না।

৮। গুহাতীর্থের পথে

যে কোন তীর্থের জন্য কোন না কোন কাহিনী প্রচলিত থাকতেই হবে। কাহিনী ছাড়া তীর্থের মাহাত্ম্য জন্মায় না। অমরনাথ নিয়েও অনেক কাহিনী। সেই সত্যযুগ থেকে প্রচলিত বলা হয়। মহর্ষি ভৃগু নাকি সর্বপ্রথম এই তুষারলিঙ্গের দর্শনলাভ করেন।

হরপার্বতী কৈলাসে নেই বলে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ত'খ'ককে পাঠান শিবের কাছে অমরনাথে। দুর্গম পথে চলার জন্য তিনি তাঁর হাতে সর্বপ্রকার বিঘ্নবিনাশন এক দণ্ড বা ছড়ি দিয়ে পাঠান। শ্রাবণী শুক্লা চতুর্থীতে যাত্রার নির্দেশ দেন। ঐ শ্রাবণী পূর্ণিমা তিথিই রাখী পূর্ণিমা। সেদিন ত'খ'ক অমরনাথ লিঙ্গ দর্শন করেন।

সেদিন থেকে শ্রাবণী পূর্ণিমা তিথিতে তুষারলিঙ্গ দর্শন ও পূজার প্রচলন হয়েছে। ঐদিন অমরনাথের দর্শনলাভ করলে মানব অমরত্ব লাভ করে। তীর্থযাত্রীর হাতে দণ্ড থাকলে পথে কোন আপদবিপদ হবে না। আজো ঐ তিথিতে তুষারলিঙ্গ দর্শন করতে ভক্তরা যাত্রা করেন দলে দলে। দণ্ড নিয়ে সে যাত্রার বর্তমান নাম ছড়ি-মিছিল। কাশ্মীরের ধর্মার্থ সঙেঘর মোহান্ত এখন ছড়ি-মিছিলের নেতৃত্ব দেন। পহেলগাঁও থেকে যাত্রা শুরু হয় দ্বাদশীতে। আগে শ্রীনগরের দশনামী আখড়া থেকে যাত্রা শুরু হত। ছড়ি বলতে একটি ত্রিশূল এবং রূপোয় মোড়া একটি লাঠি। অমরনাথ যাত্রার প্রধান মহান্তর নাম শ্রী দীপেন্দ্র গিরি।

তীর্থ হিসেবে অমরনাথ গুহা অনেক প্রাচীন বলে ইতিহাস দাবী করে। হিন্দু ব্রাহ্মণ ঐতিহাসিক কলহনের রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থটি মহারাজ জয়চন্দ্রের সময়কার লেখা। সপ্তম শতাব্দী থেকে ১১৫০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কাশ্মীরের ইতিহাস লেখা হয়েছে ঐ গ্রন্থে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে তিন হাজার বছর আগে রামদেব নামের এক রাজা শুকদেব নামের এক লম্পট রাজপুরুষকে এই গুহায় বন্দী করে রেখেছিলেন। সুতরাং গুহাটি যথেষ্ট প্রাচীন। জনৈক রাজা সৈদিমিতি ৩৪ খৃঃপূঃ থেকে ১৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। তিনি অমরনাথের তুষারলিঙ্গ দর্শন করেছিলেন। মুঘল আমলের আবুল ফজল (১৫৫১-১৬০২ খৃঃ) আইন-ই-আকবরী প্রণেতা। তিনি তাঁর গ্রন্থে অমরনাথ যাত্রার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে যান।

এরপর ইতিহাস থেকে অমরনাথ হারিয়ে যায়। তা পুনরাবিষ্কৃত হয় অষ্টাদশ কি উনবিংশ শতকে। আবিষ্কার করেন একজন স্থানীয় মুসলমান।

পহেলগাঁওর কাছে বাটকোট গ্রামে বাস করত গুর্জর মুসলমান মেষচারক, নাম আত্র(ামবাট মল্লিক। পাহাড়ের পথে ভেড়া চড়াতে চড়াতে এসে এই গুহাতীর্থ খুঁজে পান। পর্যটন বিভাগের প্রচার পত্রিকায় বলা হচ্ছে একজন 'গড়েরিয়া' মানে মেষচারক

ছিল। তার নাম বুটা মালিক। আসলে আত্র(মবাট মল্লিকই বুটা মালিক। দুজনে একই ব্যত্তি(। দরিদ্র বুটা মালিককে দয়াপরবশ হয়ে জনৈক অজ্ঞাতপরিচয় সাধু এক ব্যাগ কয়লা দিয়েছিলেন। বাড়ি পৌঁছে তিনি দেখেন ব্যাগের কয়লা আর কয়লা নেই। সব সোনা হয়ে গিয়েছে। পরদিন সাধুর খোঁজে ঘুরতে ঘুরতে বুটা মালিক গুহাটি আবিষ্কার করেন। বিস্মিত হয় দেখেন গুহার ভিতরে রয়েছে লিঙ্গাকার ধবল তুষার। কিন্তু সেই মহাত্মা সাধুর আর দেখা পাওয়া গেল না।

তারপর থেকেই এই গুহা অত্যন্ত পবিত্র তীর্থ বলে মান্য করা হতে লাগল। দেবাদিদেব মহাদেবের পীঠস্থান হিসেবে পূজার্চনা শু(হয়ে গেল। শিবের লিঙ্গ প্রতীক হিসেবে। অথবা উর্বরতার প্রতীক হিসেবে। কালে কালে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী ও ধার্মিক ব্যত্তি(রা দুর্গম গুহার তুষারলিঙ্গ দর্শন করতে শু(করেন।

১৮৯১ সালে পণ্ডিত হরিদাস টিকু দু লাখ টাকা ব্যয় করেন অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের সেবায়। তারপর থেকে কাশ্মীর রাজারাও অমরনাথ যাত্রীদের জন্যে সাধ্যমতো অর্থ মঞ্জুর করেন। বর্তমানে সরকার থেকে অমরনাথ তীর্থযাত্রার জন্যে সমস্ত রকমের জনহিতকর কাজকর্ম করা হচ্ছে। পথঘাট যথোপযুক্ত করে নির্মাণ করা, তার র'খ'নাবে'খ'ণ করা, আলো-জলের ব্যবস্থা করা, বিশ্রামাগার শৌচাগার নির্মাণ করা। এই সব কাজকর্ম।

কয়েক দশক ধরে শু(হয়েছে নতুন উপদ্রব — জঙ্গীহানা। নিরস্ত্র তীর্থযাত্রীরা সন্ত্রাসবাদীদের কাছে সফট টার্গেট। ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টি করতে অত্যন্ত কার্যকরী উপায়। সরকারের কাছে এখন তীর্থযাত্রীদের সুর'খ'াও এক বড়ো চ্যালেঞ্জ।

তীর্থযাত্রা শুরু হওয়ার অনেক আগে এখানে পৌঁছে যায় প্রশাসন। সঙ্গে সেনাদল-বিএসএফ। তারাই শীতের জমাট বরফ কেটে সাফ করে পথঘাট তৈরী করে। যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। আলো দেয়, জল দেয়। বিশ্রামাগার শৌচাগার নির্মাণ করে। চিকিৎসার সুব্যবস্থা গড়ে তোলে।

ভারতী এবং সাধনা একই সঙ্গে এসে নামল পঞ্চতরণী তাবুর কাছে। সাধনাকে ওর দাদার সংবাদ দিলাম। দাদা ওকে ফেলে অমরনাথ দর্শনে চলে গিয়েছে শুনে মনে হল মুখখানা একটু ম্লান হয়ে গেল। মুখে কিছু বলল না।

ভারতীকে বললাম — সকলেই চলে গিয়েছে। চল, আমরাও বেড়িয়ে পড়ি। সাধনাও চল আমাদের সঙ্গে।

আজ যাব কি আগামীকাল তা নিয়ে একটু দোলাচল ছিল সাধনার মনে। তারপর রাজি হয়ে গেল। আমরাও ওকে ফেলে চলে যেতে দ্বিধাগ্রস্ত। সারাটা পথ সাধনা যেভাবে ওর পিসিমণিকে আগলে নিয়ে এসেছে, তা ভোলার নয়।

একটু পরে শাশ্বতীর মা-কাকীমাও এসে পড়ল। বলল — সবাই কোথায় গেল?

— সকলে আজই দর্শনে চলে গিয়েছে। ভাবছি আমরা আজ দর্শন সেরে নেব। আপনারা কি করবেন?

— এই বাসি জামাকাপড়ে পূজো দেব কি করে? স্নানটান করা নেই। একটু শুদ্ধ না হলে কি চলে? আমরা আগামীকাল সকালে যাব। সেইরকমই তো প্রোগ্রাম ছিল।

— তা ছিল অবশ্য। আসলে আজ দিনটা পরিষ্কার ছিল তো তাই। কালকে আকাশের অবস্থা কেমন থাকবে না থাকবে কে জানে! পাহাড়ি অঞ্চলে যখনতখন আবহাওয়ার মতিগতি বদলায়।

শাশ্বতী ব্যাপারটা বুঝেছে। ও যেতে রাজি। মা কাকিমা যেতে চাইছে না। জোর করার উপায় নেই। বিশ্বাসের ব্যাপার এসব। বেহালার দুইবোন আজ কোন কারণেই যেতে রাজি নয়। সাহেবগঞ্জের দিদি এবং অনীতা ওই দলে।

ভারতীকে বললাম — তাহলে আমরা চলে যাই। ওনারা না গেলে আমরা কি করতে পারি?

ভারতী আরেক প্রস্থ যুক্তি দেখাল। বলল — শুনুন, রথেপথে বাসি জামাকাপড়ে কোন দোষ নেই। পূজো হচ্ছে নিজের মনের ব্যাপার। মন শুদ্ধ থাকলেই সব শুদ্ধ।

সমস্ত যুক্তিতর্ক বৃথা। না বুঝলে কি আর করা যাবে। ভারতীকে বললাম — চল, বেরিয়ে পড়ি।

— ঘোড়া ডাণ্ডিদের ডাক তাহলে। ওরা তো সব চা-জলখাবার খেতে গিয়েছে।

খুঁজেপেতে তাদের নিয়ে আসা হল। ভারতী সাধনা ডাণ্ডিতে উঠতে যাবে, তখন শাশ্বতী বলল — পিসিমা একটু দাঁড়ান। মা-কাকিমাও যাবে বলছে।

— ভালো। চটপট তৈরী হতে বল। অনেকটা দেরি হয়ে গিয়েছে।

আমরা ছয়জন আর সময় নষ্ট না করে অমরনাথ দর্শন করতে যাত্রা করলাম। তখন অনীতাও আমাদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল।

পঞ্চতরণী থেকে প্রথমে বেশ কিছুটা রাস্তা সমতল পাওয়া গেল। নদীর ডান তীর বরাবর। আমাদের বাম হাতে নদী আর ডান হাতে পাহাড়। নদীর ওপারেও পাহাড়। এদিকেও অনেক লঙরখানা বসেছে। তারপর আর্মি ক্যাম্প। আর্মিও যাত্রী সাধারণের জন্যে সেবার ব্যবস্থা করেছে। উষ(পানীয়।

এক কিলোমিটার এগোতে না এগোতেই শু(হল ভৈরবঘাটের চড়াই। ভীষণ ভাঙাচোরা পথ। কোথাও কোথাও যথেষ্ট সঙ্কীর্ণ। ঘোড়া চলে না। পায়ে হেঁটে যেতে হয়। পিসুটপের

বিপদের কথা খুব শুনেছিলাম। ভৈরবঘাটের চড়াই দেখছি তার থেকে কম কষ্টদায়ক নয়। ক্রমশ উপরে উঠছি।

খাঁড়া পাহাড়। কঠিন রু'খখ'। সবুজের দেখা মেলে না তেমন করে। ঝোপঝাড় চোখে পড়ছে কিছু কিছু। অনেক নিচু দিয়ে এখন পঞ্চতরণী নদী বয়ে চলেছে। এই খাদে পড়ে গেলে আর জীবনের আশা নেই।

বলা হচ্ছে এই পথের শীর্ষে অমরনাথের ে'খ'ত্রপাল ভৈরবনাথ রয়েছেন। একটি মন্দিরে তাঁর অধিষ্ঠান। ধর্মবিশ্বাসীরা মনে করেন তাঁর অনুমতি ব্যতীত শৈবতীর্থ অমরনাথে প্রবেশ করা চলে না। আমরা অবশ্য বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করে ফেলেছি। এত দেরিতে ক্যাম্প থেকে বেড়োনোর জন্যে সময়াভাব খুব। অন্ধকার নামার আগেই ফিরতে হবে। সেই ফেরার তাড়ায় তাড়িত। ে'খ'ত্রপাল তা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছেন এবং আমাদের মার্জনা করে দিয়েছেন।

পথে দেখা হয়ে গেল প্রিয়-তাপিদের দলের সঙ্গে। ওরা অমরনাথ দর্শন করে ফিরছে। বললাম — এত তাড়াতাড়ি দর্শন হয়ে গেল তোমাদের? কেমন দর্শন হল?

— খুব ভালো। খুব ভালো দর্শন করতে পেরেছি পিসেমশাই। অনেক'খ'ণ ধরে প্রাণভরে দর্শন করেছি। সত্যি বলছি মনে খুব শান্তি পেলাম। এত দূর এত কষ্ট করে আসা সম্পূর্ণ সার্থক হল। প্রিয় উচ্ছ্বসিত আনন্দে। সকলেই খুব খুশি।

— বেশি ভিড় হয়েছে দেখলে?

— না তেমন ভিড় নয়। তবে আছে একটু। এক বুক আনন্দ নিয়ে খুশিমনে ওরা চলে গেল।

চলতে চলতে এক জায়গায় এসে সৈয়দ বলল — নিচে দেখিয়ে। বালতাল সে আয়ে হ্যায় উন লোগোনে।

কয়েকজন যাত্রীকে নিচে দেখা যাচ্ছে। এখানেই তাহলে বালতালের পথ এসে মিশেছে। শ্রীনগর-লাডাখের সড়কপথে শোনমার্গ থেকে পনেরো কিলোমিটার উত্তরে বালতাল। সেখান থেকে অমরনাথ গুহা মাত্র তেরো কিলোমিটার দূরে। অত্যন্ত চড়াই এই রাস্তায়। চড়াই ভাঙতে পারলে যাত্রীদের সময় বাঁচে অনেকটা। সাধারণ যাত্রীদের প'খে' মোটেই উপযুক্ত নয় এপথে চলা।

৯। অমরনাথ দর্শন

পঞ্চতরণী-অমরগঙ্গার সঙ্গম এসে পড়ল। পবিত্র অমরনাথ গুহাও তাহলে আর বেশি দূরে নয়।

ঘোড়াওয়ালা বলছিল বটে ঐ পাহাড়টি পার হতে পারলেই গুহা এসে পড়বে। পাকদণ্ডী পথ পাহাড়ের শরীর পাকে পাকে জড়িয়ে একেবেঁকে উপরে ওঠে, নিচে নামে। এমনি করে একের পর এক পর্বতমালা পার হতে থাকে। আমরাও পার হয়ে এসেছি জম্মুর সমতলভূমি থেকে এতটা দূরত্ব।

আস্তে আস্তে সেই উদ্দিষ্ট পাহাড়ের প্রান্তে এসে পড়েছি। বাঁক পেরোতেই গতিমুখ ডানদিকে পরিবর্তিত হল। এখন অমরগঙ্গার বাম তীর ধরে পথ চলা। নদীর দুপার বরাবর পাহাড়ের শ্রেণি চলে গিয়েছে। দূরে নদীর ওপারের পাহাড়ে উপরের দিকে চোখে পড়ল। পাহাড়ের খানিকটা উচ্চতায় একটা গহ্বরের মতো কিছু দেখা যাচ্ছে না?

ঐ কি সেই বিখ্যাত অমরনাথ গুহা? ঘোড়াওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করে নিশ্চিত হওয়া গেল। হ্যাঁ ওই হল আমাদের প্রার্থিত গুহা। তাহলে এসে পড়েছি ল'খে'র কাছে! পৌঁছে গিয়েছি প্রায়! এতদিনের এত পরিকল্পনা, এত কষ্টকরা সব সার্থক হল এবার।

খুব আনন্দ হচ্ছে। সাফল্যের খুশিতে। নিচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে যে জলপ্রবাহ তার নাম অমরাবতী। কিন্তু বরফ কোথায়? শুনেছিলাম গুহার কাছে বরফের বিশাল চত্বর থাকে। নগ্নপদে তা পার হতে হবে। দেখে তো মনে হচ্ছে না বরফ আছে বলে। সত্যি তো সারা পথে বরফই পেলাম না তেমন করে। সামান্য খানিকটা মহাগুনাসে পেয়েছি মাত্র। আর তো কোথাও নেই।

পথ ক্রমশ নিচের দিকে নামছে। অমরাবতীর বেলাতটে। এপারে যাওয়ার জন্যে এখানে অস্থায়ী সেতু তৈরী করা হয়েছে। গুহা থেকে অনেকটা দূরে। সেখানে আমাদের ঘোড়া থেকে নামতে হল। বাকি পথটুকু পায়ে হেঁটে যেতে হবে।

পুণ্য অমরাবতীর জল স্পর্শ করলুম। তুষার গলা শীতল জলধারা। স্নান করা হবে না। মাথায় জলের ছিঁটে দিয়ে পবিত্র হতে হবে।

নদীর দুপারে অনেক তাবু পড়েছে। একেবারে গুহাপ্রাঙ্গণ পর্যন্ত। ঘিঞ্জি করে ফেলেছে জায়গাটা। আমরা অপে'খ'া করছি ডাণ্ডিদের জন্যে। একটু পরেই একে একে চারটে ডাণ্ডি এসে পড়ল। অনীতার ডাণ্ডি আমাদের ফেলে একটু আগেই এগিয়ে গিয়েছে।

জানা গেল ঘোড়সওয়ারিদের যাত্রা বিরতি এখানে হলেও ডাণ্ডি যাত্রীরা আরো এগিয়ে যাত্রাবিরতি করতে পারে। সেই মতো ওরা সোজা এগিয়ে গেল। সেতু পার না করে নদীর বাম তীর ধরে। আমরা ডাণ্ডির পিছনে হাঁটতে শু(করলাম।

চড়াই পথ। খানিকটা চলার পর মনে হল আর চলতে পারছি না। পা দুখানা ভেঙে আসছে। আর কতটা যেতে হবে? ওই তো গুহা। কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছি তবু মনে হচ্ছে আর পারবো না। উঁচুনিচু এবড়ো খেবড়ো পথে হাঁপাতে হাঁপাতে শাশ্বতীকে বললাম — আমি আর পথ চলতে পারছি না। তুমি এগিয়ে যাও।

— এই তো এসে গিয়েছি। আর একটু গেলেই হবে। শাশ্বতী আমাকে ভরসা দেয়।

থেমে থেমে হাঁপাতে হাঁপাতে চলেছি। এতটা এসে হার মানতেও মন চাইছে না। বোধ হয় কেউ হার মানে না। একটু সময় নেবে এই যা। পারব।

ডাণ্ডি থেকে নেমে ওরা অপেক্ষা করছিল। ভারতী বলল — হাঁপাচ্ছ কেন? কষ্ট হচ্ছে?

— তা হ-অ- চ্ছে। বে-দ-ম হয়ে প-ড়ে-ছি। হাই হাই করে শ্বাস নিচ্ছি। বুকের ভিতরে হাতুড়ি পিটছে।

— একটু জিরিয়ে নাও। মনে হচ্ছে একটু বেশি তাড়াহুড়ো করে হেঁটেছো। তা না হলে এমন হওয়ার কথা তো নয়।

— আর কথা নয়। এইটুকু পথ আসতে প্রাণ বেড়িয়ে গেল আমার।

— তাহলে বুড়ো হয়েছো বোঝা যাচ্ছে।

এখানে নদীর উপর আরেকটি সেতু রয়েছে। সেটার উপর দিয়ে অমরগঙ্গা পেরিয়ে ওপারে যেতে হল। পূজোর সামগ্রী বিক্রি করছে সারি সারি দোকান। এ সব মুসলমানদের দোকানপত্র। মহানন্দে তারা হিঁদুদের পূজার উপকরণ বিক্রি করছে এবং হিঁদুরাও তা নির্দ্বিধায় কিনছে। এরকম ধর্মীয় উদারতা সহসা দেখা যায় না সমতলে। দুর্গম এলাকায় বলেই হয়তো সম্ভব। একটি দোকান থেকে থেকে সেসব কেনাকাটা হল। জুতোমোজা খুলে ব্যাগ জমা রেখে গুহার দিকে পা বাড়ালাম।

বাঁদিকের পাহাড়ে প্রকাণ্ড গুহামুখ। তবে ঐ গুহায় প্রবেশ করতে অনেকটা উপরে উঠতে হবে। সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে লাইনে দাঁড়াতে হবে। লাইন খুব বড়ো নয় অবশ্য। খানিকটা এগিয়ে দেখছি আরেকটি সিঁড়িপথ বাদিকে।

মনে হচ্ছে এটাই ভি-আই-পিদের জন্যে বিশেষ বন্দোবস্ত। প্রিয়রা বলেছিল বটে। ও তো মিলিটারি মেজর-কর্ণেলদের বলে কয়ে ফোর্ট উইলিয়ামের ডাক্তার সেজে ভি-আই-পি লাইনে ঢুকে পড়তে পেরেছিল।

আমরা ভারতীর হাত ভাঙা দেখিয়ে সেই রাস্তায় চেষ্টা করলাম। কিন্তু কর্মকর্তাদের সহানুভূতি আদায় করতে ব্যর্থ হলাম। ভাঙা হাত নিয়ে এতটা যখন চলে আসা সম্ভব হয়েছে তখন বাকিটুকুও পারা যাবে। সত্যিই তো আমরা সাধারণ যাত্রী, কেউ ভি-আই-পি নই। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে লাইনে এসে দাঁড়িয়েছি। প্রিয় যত সহজে অনেক কিছু করে ফেলতে পারে, আমরা তা পারি না। অনীতাও আমাদের সামনে একটু এগিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

প্রহরীরা ইতিমধ্যে দুচারজনকে ভি-আই-পি লাইনে ঢুকতে দিয়েছে। হয়তো তারা প্রহরীর নিজের প্রদেশের লোক। একেবারে স্বদেশপ্রীতি না থাকাও তো ভালো নয়। আবার থাকলে অন্যরা তা নিয়ে স্বজনপোষনের অভিযোগ তুলবে। এই হয়েছে সমস্যা।

একদিকে যা করলে ভালো হয়, অন্যভাবে দেখলে তা মন্দ। এ নিয়ে মৃদু গুঞ্জন উঠল আমাদের লাইনে।

ভারতীকে বললাম — কি হবে চেঁচামেচি করে? চুপচাপ থাক।

বিদ্রোহের বয়সটা পার করে এনেছি। এখন এই ধরাধাম থেকে বিদায় নিতে পারলেই ল্যাঠা চুকে যায়। আমাদের দেশটার নাম ভারতবর্ষ। বর্তমানে এদেশে নীতিহীনতাই নীতি। নীতিপরায়ণদের কপালে হয়রানি ছাড়া কিছু নেই। ঘরে বাইরে সর্বত্র। তারা সংখ্যায়ও অত্যন্ত অল্প এবং ভীতু সম্প্রদায়ের। প্রবল চরিত্রবল নেই সুতরাং পলায়ন-প্রবৃত্তিই সম্বল। দুচারজন সাহস করে প্রতিবাদ করতে যায় বটে কিন্তু আমজনতার চাটিতে কিংবা প্রশাসনের হেনস্থায় তাদের দফারফা। তার থেকে ভালোমানুষের মতো লাইনে দাঁড়াও। শৃঙ্খলাপরায়ণ হও। ভদ্র নাগরিক হিসেবে গণ্য হবে। যারা করার করুক — দেখেও দেখো না, শুনেও শুনো না।

খুব বেশি সময় লাগল না মন্দির গুহায় প্রবেশের ছাড়পত্র পেতে। একদল করে ভিতরে যাচ্ছে। তাদের পূজার্চনাদি হয়ে গেলে আরেক দলকে গুহার ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে। এক সময় আমরাও গুহামন্দিরে প্রবেশের অনুমতি পেলাম।

এই সেই বহুশ্রুত অমরনাথ গুহা। এখানে স্বামী বিবেকানন্দ ভগিনী নিবেদিতাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন ১৮৯৮ সালের আগস্টে। একশ' তিন বছর আগে। হিন্দুধর্মকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কোন ধর্মকেই অবজ্ঞা করেন নি। আদ্যন্ত মানবতাবাদী এক মহাপ্রাণ তিনি। বলা হয় তিনি এখানে মহাদেবের কাছে ইচ্ছামৃত্যু বর লাভ করেন। আমার মনে হয় ব্যাপারটা সেরকম নয়। তাঁর ছিল অত্যন্ত সংবেদনশীল এক মন এবং কর্তব্যকর্মে নিরলস সাধনা। কর্তব্যকর্ম সম্পূর্ণ না করে আমার 'খা'ন্তি নেই, আমার মৃত্যু নেই — এমন ভাবই জাগ্রত হয়েছিল তাঁর মনে। সেই ভাবে প্রবল আস্থা জন্মেছিল তাঁর। ইচ্ছামৃত্যু বরে তারই প্রকাশ। তা না হলে, মাত্র উনচল্লিশ বছর বয়সে এমন কর্মবীরের জীবনাবসান হয়? চব্বিশ বছর পরে এখানে পদার্পণ করেন স্বামী অভেদানন্দ। প্রবোধ সান্যাল মশাই এসেছিলেন ১৯৫৩ সালে। তার চব্বিশ বছর পরে এসেছেন শঙ্কু মহারাজ। তাঁর ভ্রমণকাহিনী পড়ে অনেক জ্ঞান সঞ্চয় করেছি।

সাধারণত গুহা বলতে সঙ্কীর্ণ প্রবেশপথের কথাই মনে হয়। যেমন দেখেছি বৈষ্ণোদেবীর গুহায়। অমরনাথ গুহাটি ব্যতিক্রম। এর মুখটি বিশালাকার। কিন্তু ভিতরটা ক্রমশ ছোট হয়ে গিয়েছে। গুহার সামনে ছিটেফোটা বরফ নেই কোথাও। তবু ভীষণ ঠাণ্ডা। উঁচু ছাদ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। চারদিকটা ভিজে ভিজে।

গুহার উপরদিকের পাথরে একজোড়া কপোত-কপোতী দেখা যাচ্ছে। সমবেত দর্শনার্থীরা পায়রা দেখে সমস্বরে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল — জয় বাবা অমরনাথ।

— বোম বোম ভোলে।

অমরনাথের রহস্যকথা জানা না থাকলে দেবদর্শন অপূর্ণ থাকে। সমস্ত রহস্যকথার প্রধান আকর পুরাণাদি গ্রন্থ। এক একজন দেবতার মাহাত্ম্যকথা নিয়ে এক একটি পুরাণ। শিবের নামেও একাধিক পুরাণ আছে। তো সেই পুরাণ কথায় বলে, কলহপ্রিয় নারদমুনি শিবজায়া পার্বতীকে একদিন কুমন্ত্রণা দিলেন। বলেছিলেন – আপনি দেবী হলে কি হবে, অমর নন।

তাইতো, এ কথা পার্বতীর আগে নজরে পড়েনি। নারদমুনি নাকি আরো বলেছিলেন – ওই যে দেখছেন আপনার পতিদেবতার গলায় মুন্ডমালা, সে সব আপনারই নানা জন্মের। তাহলে বুঝেছেন তো উনিই অমর দেব, আপনি নন।

শিবজায়া বললেন – তাই তো দেখছি। তাহলে কি করে অমরত্ব লাভ করা যায়?

অমৃতসুধা পান করলে অমরত্বলাভ সম্ভব। সাগর মন্থন করে সে অমৃতলাভ হয়েছিল। কিছু কিছু দেবতা তা পান করে অমর হয়েছিলেন। অমরত্বলাভের আরেকটি উপায় আছে। নারদমুনি সেই উপায়ের কথাটি বললেন পার্বতীকে।

– শিবের কাছে সৃষ্টিরহস্য শুনলে দেবতাদেরও অমরত্ব লাভ হয়। ভগবান শিব সৃষ্টিরহস্য জানেন, তাই তিনি অমর।

শিবজায়া পার্বতী সৃষ্টিরহস্য জানতে অতীব উৎসুক হলেন। ভোলানাথকে হুমকি দিলেন – তিনি সৃষ্টি-রহস্যকথা শুনতে চান। যদি তাঁকে সেই অমর সৃষ্টিকথা না বলা হয়, তবে তিনি আবার দেহত্যাগ করবেন।

ভোলেভালা মহাদেব পড়লেন মহা সমস্যায়। এই তো একবার দ'খ'যজ্ঞ চলছিল যখন, দ'খ'কন্যা সতী পতিনিন্দা সহ্য না করতে পেরে দেহত্যাগ করেছিলেন। বিষু(সতীর দেহ ছিন্নভিন্ন করে একান্ন পীঠে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। সে পর্ব যাহোক মিটেছে। এখন আবার দেহত্যাগ! যা একগুঁয়ে মেয়ে। জিদ ধরলে তা না করে ছাড়বে না। এখন কী উপায়?

সৃষ্টিরহস্য অতীব গুপ্তকথা। তা সকলের জ্ঞাতব্য নয়। নিখিল জগতে মাত্র তিনচার জন সেসব জানেন। আমদেবতাদের কাছ থেকেও এই গুপ্তকথা সম্পূর্ণ গোপন রাখার কথা। অথচ শিবজায়া যেভাবে গোঁ ধরেছেন যে তাঁকে না শুনিয়ে আর উপায় নেই। কি করে ব্যাপারটা গোপন রাখা যায় আবার পার্বতীকে বলাও যায়? বলতেই যখন হবে তখন খুব গোপন কোন জায়গায় বসে বলতে হবে যাতে আর কেউ যেন তা না শুনতে পায়। কোথায় সেই বিজন স্থান যেখানে বসে গোপনে তা বলা যায়?

ভেবেচিন্তে একটি স্থান নির্বাচিত হল। হিমালয় পর্বতমালা দিয়ে ঘেরা কাশ্মীর হল সেই দুর্গম স্থান। তারই এক প্রত্যন্ত পার্বত্য অঞ্চলে বসে কোথাও বলা হবে সেই অপূর্ব সৃষ্টিরহস্য, অমর কথাকাহিনী। স্বর্গলোকে বিজন স্থানের অভাব। কৈলাসেও ভিড়ভাট্টা খুব। তাই তো ধরাধামে খুব দুর্গম একটি জায়গা বাছতে হল।

ত্রিশূলাঘাতে নির্মিত হল একটি গুহা। এই সেই গুহা। এখানে বসে দেবাদিদেব শিব পার্বতীকে সেই অপূর্ব সৃষ্টিরহস্য শুনিয়েছিলেন। এখানে বসে সৃষ্টিরহস্য শুনলে অমরত্ব লাভ হয়!

এই ফাঁকে বলে রাখি শিবজায়া পার্বতীকে সৃষ্টিকাহিনী শুনে তবে তাঁকে অমরত্ব লাভ করতে হবে একথা জেনে খুব তৃপ্ত হওয়া গেল না। তা না হোক। কাহিনী নিয়ে এত কিন্তু কিন্তু করতে নেই। তাতে রসভঙ্গ হয়।

দেবাদিদেব পার্বতীকে নিয়ে অমরনাথ গুহার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। পথে বাহন নন্দীকে পহেলগাঁওতে, জটাশ্রিত চন্দ্রদেবকে চন্দনবাড়িতে, কণ্ঠভূষণ সর্পকে শেষনাগে, কনিষ্ঠপুত্র গণেশকে মহাগুনাস গিরিবর্ত্মে এবং পঞ্চভূতকে পঞ্চতরণীতে ত্যাগ করে গুহায় এসে উপস্থিত হলেন। গুহাটি সম্পূর্ণভাবে প্রাণহীন করতে কালাগ্নি নামক এক রুদ্র সৃষ্টি করলেন। সেই রুদ্র সমস্ত গুহাকন্দর দগ্ধ করে ফেলল। শিবের আসনের কাছে ছিল একটি পাখির ডিম। অচেতন বস্তু মনে হয়েছিল তা। তাছাড়া শিবাসন স্পর্শ করেছিল বলে অগ্নিদাহ থেকে সহজে নিষ্কৃতিও পেল।

দেবাদিদেবের অনুপম সৃষ্টিকাহিনী শুনতে শুনতে পার্বতী কখন সমাধিস্থ হয়ে পড়েছেন মহাদেব তা বুঝতে পারেন নি। তাহলে কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে হু হা করে এত'খ'ণ সাড়া দিচ্ছিল কে? তাকিয়ে দেখেন গুহায় বসে রয়েছে এক জোড়া শুকপাখি। অগ্নিদাহ থেকে র'খ'া পাওয়া সেই ডিম থেকে ইতিমধ্যে তাদের জন্ম হয়েছে।

অন্যকাহিনী মতে, রাধা-কৃষ(মর্তে আগমন করায় বিরহাতুর হয়ে তারা নেমে আসে ধরাধামে। উড়তে উড়তে শ্রান্ত হয়ে অপে'খ'া করছিল এই গুহাকন্দরে। হর-পার্বতী তখন সেখানে বসে অমর সৃষ্টিকথা বলছিলেন। আরেক মতে এঁরা ছিলেন শিবের অনুচর। লুকিয়ে অমরকথা শুনে ফেলেছিল বলে শিব তাঁদের পায়রা বানিয়ে দেন।

শুকপাখিদের আবির্ভাব যেভাবেই হোক না কেন, তারাই তাহলে সাড়া দিচ্ছিল মহাদেবের কাহিনীপ্রবাহ অ'খ'ুন্ন রাখতে। সেই অপূর্ব সৃষ্টিকাহিনী শুনে পাখি দুটিও বেমক্কা অমরত্ব লাভ করে ফেলল। লুকিয়ে অপরের গোপন কথা লুকিয়ে শোনা নিশ্চিত অপরাধ। তার উপর সে কথা যদি অমরকথা হয় তাহলে তো অপরাধ বলে গণ্য করতে সামান্য দ্বিধারও অবকাশ নেই।

ক্রোধান্বিত মহাদেব ত্রিশূল নিয়ে ছুটলেন শুকপাখি বধ করতে। উনি রাগের বশে খেয়াল করেন নি যে শুকপাখিদুটি ইতিমধ্যে অমরকথা শুনে অমরত্ব লাভ করে ফেলেছে। ফলে তারা দু'জনে এখন অবধ্য।

গুহার প্রবেশপথে আমরা দুটি পাখি দেখেছিলাম। সেদিনের অমর পাখিরাই নাকি আজো গুহায় এসে বসে। আমাদের সন্দিগ্ধ মন বলে, তা কি হতে পারে? জগতে কোন কিছুই তো অমর নয়। সবই 'খ'য় পায়, লোপ পায়। তাহলে? আসলে পূজারীরা সঙ্গে

করে নিয়ে আসেন এক জোড়া পায়রা। অগণিত মানুষের একান্ত বিশ্বাসের মর্যাদা দিতে। যে মর্যাদার বলে ভক্তরা দেবতার আশীর্বাদ নিতে অনেক কষ্ট স্বীকার করে এখানে আসে সেই মর্যাদার কারণে। যাই হোক কাহিনী শেষ করা যাক।

রুষ্ট ঈশানের ভয়ে ভীত শুকপাখিদুটি উড়তে উড়তে চলে যায় বদরিকাশ্রমে। সেখানে ব্যাসপত্নী বটিকাদেবী তখন সূর্যপ্রণাম করছিলেন। শুক তাঁর মুখবিবরে প্রবেশ করল আত্মর'খ'ার জন্য। মহাদেব পড়লেন মহা ফাঁপড়ে। শুকপাখি বধ করতে হলে ব্যাসপত্নীকে বধ করতে হয়। তা সম্ভব নয়। তত'খ'ণে তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হয়েছে। উপলব্ধি করেছেন যে পাখিদুটি ইতিমধ্যে অবধ্য হয়ে গিয়েছে। এখন রণে ভঙ্গ দেওয়াই মঙ্গল।

মহাদেব নতি স্বীকার করলেন। বটিকাদেবীকে আশীর্বাদ করে বললেন — এই শুক তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করবে। এবং মহাজ্ঞানী হবে। আমিও অমরনাথ গুহায় চিরস্থায়ী হব।

বটিকাদেবীর পুত্রের নাম হল শুকদেব। ব্যাসপুত্র। মহাদেব শ্রাবণী পূর্ণিমা তিথিতে অমরকথা শুনিয়েছিলেন বলে এই তিথি কেন্দ্র করে মানুষের মেলা ও উৎসব।

জগতের সৃষ্টিকাহিনী জানার ইচ্ছে আমারও প্রবল। প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদে বর্ণিত সৃষ্টিকাহিনী খুব জটিল নয়। চার বেদের মধ্যে আদি হল ঋগ্বেদ। সৃষ্টির মূল রহস্য সেই ঋগ্বেদের একাধিক সূত্রে ব্যক্ত হয়েছে। যেমন দশম মণ্ডলের ১২৯-তম সূক্ত হল নারদীয় সূক্ত। অপূর্ব কাব্যিক সুষমায় সেখানে বিধৃত হয়েছে — 'সেকালে যা নেই তাও ছিল না, যা আছে তাও ছিল না। পৃথিবীও ছিলনা অতি-দূর বিস্তৃত আকাশও ছিল না। আবরণ করে রাখে এমন কি ছিল? কোথায় কার স্থান ছিল? তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না, রাত্রি-দিনের কোন প্রভেদ ছিল না। কেবল তিনি একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতীরেকে আত্মা মাত্র অবলম্বন করে নিশ্বাস-প্রশ্বাস যুক্ত হয়ে জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। সর্বপ্রথমে অন্ধকার দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। কোথাও কোন চিহ্ ছিল না, সমস্তই চিহ্(বর্জিত ছিল। চতুর্দিক ছিল জলময়। অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা তিনি সর্বব্যপী আচ্ছন্ন ছিলেন।'

সৃষ্টি বিষয়ে আরো রচনা আছে ঋগ্বেদের ৮২-তম বি(কর্মা সূক্তে, ৯০-তম পু(ষ সূক্তে, ১২১-তম প্রজাপতি সূক্তে এবং ১২৫-তম আত্মাসূক্তে। প্রায় সকল পুরাণেও সৃষ্টিকাহিনী বর্ণিত হয়েছে। যেমন শ্রীমদভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে, অগ্নিপুরাণে বা বিষু(পুরাণে। সে সবের বর্ণনায় যথেষ্ট ভেদাভেদ আছে। আবার বাইবেলের

জেনেসিস অধ্যায়ে সম্পূর্ণ অন্যরকমভাবে জগত সৃষ্টির কথা প্রকাশিত হয়েছে। এসবের মধ্যে কোন বিবরণ সত্য?

বিজ্ঞান বিষয়ে পঠনপাঠনের সুবাদে যুক্তি প্রমাণকেও অবজ্ঞা করতে পারা যায় না। বস্তুত যুক্তি কে অমান্য করে চলা মুস্কিল। প্রমাণকে অস্বীকার করা যায়? সবকিছু এই মুহূর্তে প্রমাণিত নয় বটে তবে জ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তো দেখছি অজ্ঞানতাই বিদূরিত হচ্ছে। বিজ্ঞানচর্চা করার সুবাদে বিশ্বসৃষ্টির রহস্য বেশ কিছুটা জানতে চেষ্টা করেছি। সেকথা আমার মতো করে কোথাও না কোথাও বলার চেষ্টাও করেছি। জ্ঞানান্বেষী বলেই খোঁজ করেছি সর্বত্র। সত্য জানার আগ্রহে হিসেবটা মেলানোর গরজে। মোদ্দা কথা হল দুদিক থেকে দেখতে গেলে হিসাবটা মিলছে না।

বলুন তো — এত ধর্ম কেন হবে জগতে? স্রষ্টার নির্মাণে একটি ধর্ম থাকাই উচিৎ ছিল। এক জাতি এক বর্ণ থাকাই উচিৎ ছিল। এত বিভেদ সৃষ্টি করার কী দরকার! লীলা বলে চালানোটা চতুর মানুষের কারসাজি বলে মনে হয়। অনেক ধর্ম নয়। থাকা উচিত ছিল একটাই ধর্ম এবং তা হল মানবধর্ম।

এই জগত কি করে সৃষ্ট হল আমি তা জানতে চাই। এর পরিণতি কি তাও জানতে চাই। মানুষ কোথা থেকে এল জানতে চাই। মানবজীবনে কেন এত পাপ-পুণ্য, কেন এত দুঃখ-দারিদ্র্য-ভেদাভেদ রক্তপাত-হানাহানি সবই জানতে চাই। মনে হয়, মানুষের সর্বপ্রধান শত্রুও মানুষ, মিত্রও মানুষ। জগতে কেন যে আমরা আবিশ্ব একটি মানবধর্ম নির্মাণ করতে পারি না এবং তার চর্চা করতে পারি না! এসব জানতে ইচ্ছে করে। জেনে কী লাভ? লাভ আছে। জ্ঞানেই মুক্তির উপায় খুঁজে পাওয়া যায়। আমি দুর্বলচিত্ত বলে কিছুই করতে পারব না। সময়ও নেই আর। বেলাশেষের ঘন্টা বাজছে। তবু এক তাড়নায় চালিত হই।

তত্ত্বকথার কচকচি থাক। যুক্তি আর বিশ্বাসের দ্বন্দ্বে মীমাংসা কঠিনতম কাজ। বোধ হয় অসম্ভব। অমরতীর্থ অমরনাথ দর্শন করতে এসেছি, তাই দর্শন করি।

গুহার বিপরীত দিকে অমরগঙ্গার ওপারে রয়েছে একটি পাহাড়। পঞ্চশীর্ষ তার। কে যেন বলল, এ হল বাসুকিনাগ? পাহাড় কখনো নাগ হয়? মানুষের বিশ্বাস হলে সবই হয়। গুহার ভিতরে জল পড়ে যেমন করে স্ট্যালাকটাইট-স্ট্যালাগমাইট তৈরী হয় তেমনি করেই এই তুষারলিঙ্গের সৃষ্টি। প্রাকৃতিক নিয়মে। তবু আমাদের বিশ্বাস করতে ভালো লাগে এঁর মাহাত্ম্য। এঁর স্বয়ম্ভূ প্রকাশ।

গুহার সামনে উঁচু বেদি। রেলিং দিয়ে ঘেরা। বেদির উপর ডানদিকের প্রান্তে গুহাপ্রাচীর ঘেঁষে বিরাজ করছে ধবল তুষারমণ্ড। এই সেই স্বয়ম্ভূ তুষারলিঙ্গ! দেবাদিদেব অমরনাথ।

স্বয়ম্ভূ কেননা কেউ তাঁকে নির্মাণ করেনি। তিনি আপনা আপনি জাত হয়েছেন। লিঙ্গটি দশবারো ফুট উঁচু হবে। উপরের ছাদ স্পর্শ করতে হাতখানেক বাকী। বাঁ দিকে পার্বতী এবং গণেশ মূর্তি। দু'টুকরো বরফখণ্ডকে পার্বতী ও গণেশের প্রতীক হিসেবে মানা হয়েছে। হিন্দুরা শিবের পূজো করতে শিবলিঙ্গকে পূজা করে। সে ব্যাপারটা তবু বোঝা যায়। কিন্তু এই তুষারমণ্ডকে পার্বতী-গণেশ মূর্তি বলে বোঝা কঠিন। কথায় বলে বিশ্বাস। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর। তেমন বিশ্বাস হলে তা মানতে আর বাধা কোথায়?

অনেক কাল আগে পুণ্যার্থীরা গুহার ভিতরে ঢুকে এই তুষারলিঙ্গ স্পর্শ করতে পারত। এখন আর সে সুযোগ নেই। গোটা চত্বর লোহার রেলিং দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। এত পুণ্যার্থীর দেহসঞ্জাত উত্তাপে বরফ গলে জল হয়ে যায়। তাই দূর থেকে দেখার ব্যবস্থা। এত সাবধান হওয়া সত্ত্বেও নাকি রাখী পূর্ণিমার দিন তুষারলিঙ্গের তুষার গলে জল হয়ে যায়। দেখবার মতো কিছু অবশিষ্ট থাকে না।

ভিতরে পূজারীরা ডালা নিয়ে পূজো করে ফেরত দিচ্ছে। পূজারীদের সাহায্য করার জন্যে শান্তির'খ'করাও এ কাজে হাত লাগিয়েছে। বাড়ি থেকে অনেকে পূজো দিতে টাকা দিয়েছে ভারতীকে। মামণি মানে দীপিকা হালদার, ভারতীর বন্ধু এবং সহকর্মী কৃষ(া চক্রবর্তী ও মমতা দাস।

ভারতী পূজার ডালা এগিয়ে দিল। পূজারি অনতিকাল পরে তা ফেরত দিল। সেই সঙ্গে দেবতার প্রসাদ হিসেবে কয়েকটি মুদ্রা। বৈষে(াদেবীর কাছেও এমনি খানকয়েক মুদ্রা প্রসাদ হিসেবে পেয়েছিলাম। ভক্ত রা অযাচিত হাতে দ'খি'ণা নিবেদন করছিল সংর'খি'ত বাক্সে। না, এখানে পাণ্ডাদের উৎপাত নেই। ফলে দ'খি'ণা হিসেবে কোন অর্থের দাবীদাওয়া নেই। এখানে রয়েছে কেবলমাত্র ভক্ত এবং দেবতা। তীর্থস্থান থেকে পুণ্যার্থীদের গলায় গামছা দিয়ে অর্থ আদায় করা হয় না। এ ব্যাপারটা জেনে খুব ভালো লাগল।

আরো এক আশর্চ্য কথা শুনতে পেলাম। অমরনাথ পূজোর প্রাপ্ত দ'খি'ণার এক ভাগ এখনো নাকি গুহা-আবিষ্কারক মুসলমান আত্র(মবাট মল্লিকদের প্রাপ্য হয়। এরকম কথা অন্য কোথাও শুনিনি। একান্ত কোন হিন্দুতীর্থের পূজার ভাগ কখনো কি কোন মুসলমানের পাওনা হতে পারে? সাধারণ বুদ্ধিতে বলে, তা না পাওয়ারই কথা। কিন্তু এখানে দেখছি পেতে পারে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চমৎকার নজির এটা। কাশ্মীরে নানা ধর্মের মধ্যে সহিষ্ণু(তার চমৎকার উদাহরণ? সেরকম কিছু হবে হয়তো, এমনটা ভেবে নিলাম।

পিনাকপাণি শিব ভারতবর্ষের প্রাচীনতম দেবতা। শিবই মহাদেব, দেবাদিদেব এবং আদিদেব। আর্যপূর্ব হরপ্পা সভ্যতায় হয়তো তাঁরই চিত্র আমরা দেখেছি হরপ্পার শিলমোহরে। যোগাসনে উপবিষ্ট অনার্যদের দেবতা হিসেবে। শিবের পোষাক আচার আচরণ আহারবিহার সবই অনার্য সভ্যতার ভাবধারা প্রকাশ করে। আর্যসভ্যতায় ঋগ্বেদের আমলে প্রধান দেবতা ছিল ইন্দ্র-বর(ণ-অগ্নি এঁরা। পুরাণের যুগে প্রধান দেবতা হয়ে এসেছেন ব্রহ্মা-বিষু(-মহেশ্বর। কখনো কখনো রাম বা কৃষ(। দ'খ'যজ্ঞ কাহিনীতে পাই শিবের তাণ্ডব। যজ্ঞের ভাগ তাঁকে দিতে অস্বীকার করার জন্য শিবের প্রলয়নৃত্য। পরে তাঁকে তিনজন প্রধান দেবতার মধ্যে একজন বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। ব্রহ্মা-বিষু(-মহেশ্বর এই ত্রয়ী হন মূল দেবতা।

গুহার বাঁ দিকে এক জায়গায় পবিত্র প্রস্রবণের জল বিতরণ করা হচ্ছিল। সকলেই ভিড় করেছে সেখানে। আমরাও একটি পাত্রে তা সংগ্রহ করলুম। পুণ্যলাভে কোনভাবেই যেন বঞ্চিত না হই। অনেক কষ্ট করে অনেক অর্থব্যয় করে এখানে আসা হয়েছে। তা কড়ায়গণ্ডায় উশুল না করলে চলবে কেন? যাদের হয়ে পূজো দিতে হয়েছে তাদের পবিত্র তীর্থের পুণ্যজল দেব খানিকটা করে। খুশি হবে।

এবার বিদায়ের পালা। অমরনাথ দর্শন হয়েছে। পূজার্চনা হয়েছে। যার যা প্রার্থনা করার ছিল তা নিবেদিত হয়েছে। ঈশ্বরের কাছে আমার কি কিছু প্রার্থনা করার ছিল? না, সেরকম কিছু তো আমার থাকার নয়। আমি একান্তই এক দর্শনার্থী। মুগ্ধ দ্রষ্টা। জ্ঞানই আমার পিপাসা। জগতকে জানতে আগ্রহী। জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে মনুষ্যসমাজের মঙ্গলাকাঙ্খী। সে মঙ্গল কোন পথে অর্জিত হতে পারে তা নিয়ে সংশয়ক্লিষ্ট। তবু মনে হচ্ছে দেহমন পবিত্র হয়েছে। প্রকৃতির এমন নির্বিকার প্রকাশের মধ্যেও হৃদয় আনন্দরসে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। এখানে জাগতিক কোলাহল নেই। স্বার্থদ্বন্দ্ব নেই বা যা আছে তা তেমন করে প্রকট নয়। মানবিক পাপ-ক্লেদ থেকে অনেকটা মুক্ত পরিবেশ। আসলে 'খ'দ্র মানুষ মহাশক্তির সামনে ভীত এবং উদার হয়ে পড়ে। দেবতার সংস্পর্শে দেবত্বে উন্নীত হওয়া বোধ হয় একেই বলে।

পায়ে পায়ে নিচে নেমে এল ভারতী আর সাধনা। এবার অন্যপথে নেমে যেতে হবে। শাশ্বতী ওর মা-কাকিমাকে নিয়ে নেমে এল। ভারতীর ডাণ্ডির দু'জন বাহক এগিয়ে এল। হাতে ধরে সন্তর্পণে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামাল ওকে।

বললাম — শেষ পর্যন্ত ভাঙা হাত নিয়ে অমরনাথ দর্শন করে ছাড়লে।

— এত সহজে হার মানব?

বড়ো কোন বিপত্তি হয়নি সেই র'খে' । শুধু ওর ডাণ্ডিওয়ালারা সংখ্যায় মাত্র চারজন হওয়ার জন্যে খুব ভোগাচ্ছে। কাঁধ বদলানোর জন্যে অতিরিক্ত কুলি নেই। ফলে

খানিকটা যাওয়ার পরে পরে ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। বিশেষ করে বুড়ো সর্দার আবদুল্লা। বারবার বিশ্রাম নিচ্ছে। চা খাওয়ার জন্যে পয়সা চাইছে। বাদাম-কিসমিস খেতে চাইছে।

দোকানে ফিরে গিয়ে তিনজনে জুতোমোজা পরে নিয়েছি। টুকটাক দুচারটে জিনিস কেনা হল। অমরনাথের স্মৃতিচিহ্(হিসেবে। সাধনাও কিনল কিছু। শাশ্বতীরা একটু এদিক ওদিক ঘুরছে বোধ হয়। পুণ্যার্থীরা পুণ্য সঞ্চয় করল দেবদর্শন করে। ডাণ্ডিওয়ালা ঘোড়াওয়ালারা সেই খুশিতে বখশিশ চাইল। বড্ড গরীব এরা। এদের অখুশি রাখা অনুচিত।

উল্টোদিকে বসেছে এক ভাণ্ডারা। তীর্থযাত্রীদের সেবার আয়োজন করেছে তারা। নানাপ্রকার সুখাদ্য পরিবেশিত হচ্ছে। সুগন্ধে চারদিক মম করছে। মনে হল খিদে পাচ্ছে। ভারতী বলল — হ্যাঁ আমারও খি দে পেয়েছে। চল, কিছু খাওয়া যাক।

কাছে যেতেই করজোড়ে জানাল তারা — মহারাজজি, সেবাকা মওকা দিজিয়ে। আইয়ে না আইয়ে।

এমন অযাজিত আপ্যায়ণে মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই। শুধু এখানে নয়, অমরনাথের সর্বত্র একই দৃশ্য। অভাবিত মনে হয়। মনে পড়ল অশোক পইপই করে বলে দিয়েছিল — মেজদি, ভাণ্ডারার খাবার খেতে ভুলবেন না। দারুণ খাবার খাওয়ায় ওরা। একদম খাঁটি জিনিস দিয়ে বানানো।

সানন্দে তাদের প্রসাদ গ্রহণ করলাম। পায়সান্ন। অশোক ঠিকই বলেছিল। ভারি সুস্বাদু এদের খাদ্যদ্রব্য। ডায়বিটিস চুলোয় যাক। আরেক পাত্র প্রসাদ না নিলেই নয়।

শঙ্কু মহারাজের বইতে পড়েছি অমরনাথ থেকে দেড় মাইল দূরে আছে কণ্ঠেশ্বরীর মন্দির। সতীর কণ্ঠ পড়েছিল সেখানে। না আমাদের সেসব দেখার কোন বাসনা নেই। সামর্থ্যও নেই।

পড়ন্ত বিকেল। পায়ে পায়ে এগিয়ে যাই ডাণ্ডির কাছে। এসে দেখি, শাশ্বতীরা তখনো ফিরে আসেনি। বিকেলের আলো ম্লান হচ্ছে ধীরে ধীরে। ফিরতে হবে পঞ্চতরণী। ওদের বাদ দিয়ে রওনা হওয়া যায় না। অপে'খ'া করতেই হবে। সঙ্গী ফেলে চলে যাওয়া আমাদের কাছে অধর্ম কেননা তা অমানবিক।

একটু পরেই ওরা চলে এল। চারখানা ডাণ্ডি রওনা করে দিয়ে আমি আর শাশ্বতী ঘোড়ায় চেপে বসলাম।

বিকেল প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে। সন্ধ্যা হয় হয়। অমরনাথ থেকে ফিরে যাওয়ার দলে আমরাই বোধ হয় শেষ যাত্রীদল। নির্জন পাহাড়ী পথ। শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারব কিনা কে জানে! কি করব তখন মাঝপথে? কে জানে! মনে মনে ভয় করছে। পথে আটকে পড়তে হলে কোথায় রাত কাটাব? মনে মনে একটা ভরসা করা যায় এখানকার

চমৎকার ব্যবস্থাপনা দেখে। যেমন চমৎকার আয়োজন দেখছি — পথে নিশ্চয়ই কোন না কোন আস্তানা জুটে যাবে।

ঝুপসি অন্ধকার নামার আগেই পাহাড়ি চড়াই-উৎরাই পার হয়ে সমতলে নেমে এসেছি। ডাণ্ডিরাও বেশি সময় নেয়নি উঁচু পাহাড় থেকে নেমে আসতে। ফিরে এসেছি তাবুতে। তখন সময় আটটা।

পঞ্চতরণী ফিরে শুনি প্রিয় ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিল।

— কি করে পড়লে ডাক্তার?

— আর বলবেন না। ঘোড়াটা দাঁড়িয়েছিল একটু উঁচু জায়গাতে। এক পা ওখানে রেখে নিচে নামব ঘোড়ার পিঠ থেকে অমনি ঘোড়াটা গেল উঁচু জায়গাটা থেকে সরে। ব্যস পা রাখার জমি না পেয়ে একেবারে নিচে। ঘোড়াও কাত হয়ে পড়ল।

— লেগেছে কোথাও?

— পেটে চোট লেগেছে। বেশ ব্যথা।

আমাদের একটি দল আজকে অমরনাথ দর্শন করতে যায় নি। ওনারা আগামীকাল যাবেন। ওই দলে রয়েছে অরুণ পাত্র, তাপস ঘটক, মিতালী ঘটক, সাহেবগঞ্জের ভদ্রমহিলা, বেহালার শীলা ঘোষ ও রিনা সরকার। মোট ছয়জন।

সাহেবগঞ্জের ভদ্রমহিলাকে প্রথমে সত্যিই দেবদ্যুতির কাকিমা মনে করা হয়েছিল। পরে জানতে পারা যায় যে তা ঠিক নয়। উনি গত বছর অমরনাথ দর্শনে এসেছিলেন। চন্দনবাড়ি থেকে দর্শন না করেই সেবার তাকে ফিরে যেতে হয়। প্রবল বর্ষণের জন্য। অথচ কী অসীম প্রত্যয়ে উনি আবার একা এসেছেন সাহেবগঞ্জ থেকে কোলকাতা হয়ে অমরনাথ। ভক্তিনম্র এই রকম কত শত প্রাণের স্পন্দন মেলে তীর্থের পথে পথে। তাদের দর্শনও দর্শন। ভক্তই দেবতার নিদর্শন। নইলে দেবতা নেই।

আজকের রাত আমাদের পঞ্চতরণীতে কাটাতে হবে। পার্বত্য প্রদেশে আমাদের দ্বিতীয় রাত। একদিনে শেষনাগ থেকে রওনা হয়ে গুহা দর্শন করে আবার পঞ্চতরণী ফেরে আসা সহজ কথা নয়। অর্থাৎ আমরা একদিন সময় বাঁচাতে পেরেছি।

অনেকদিনের শখ ছিল এই দুর্গম পথের পথিক হওয়ার। শেষ হল বহুপ্রতীখি'ত সেই অমরনাথ দর্শন। মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে দেবদর্শন করতে এত কষ্ট স্বীকার করে চলা — কোন মানে হয় এর? এর জন্যে কত সময় ধরে কত আয়োজন করতে হয়েছে! কত দূরদূরান্ত থেকে যাত্রা করতে হয়েছে। কত অর্থব্যয় করতে হয়েছে। তবু মানুষ ছুটে আসছে মহাতীর্থে। কিছু পায় বলেই না তারা এত কষ্ট স্বীকার করে আসে। কী পায় সেই দুর্গম যাত্রাপথে বেরিয়ে?

অমরনাথে থাকার ব্যবস্থাও আছে দেখেছি। সব থেকে আশ্চর্য হলাম কোথাও এক টুকরো বরফ পেলাম না বলে। খোদ বরফের রাজ্যে বরফ নেই। ভাবা যায়! অনেক মানুষের আনাগোনায় কিভাবে পরিবেশদূষণ ছড়াচ্ছে এ যেন তারই নমুনা। বরফ রাজ্যের বরফই হাওয়া। দূষণের জন্যে পৃথিবীর সামগ্রিক আবহাওয়াটাই বদলাচ্ছে। মানুষের প('খ'তিকর হয়ে উঠছে।

রাতে খাওয়াদাওয়ার পাট চুকেছে। ঘুম আসছে না।

সেদিন অনেক রাতে তাপস ঘটক ডাকল — পিসেমশাই, বাইরে আসুন একবার।

— কি হল?

— বাইরে বেড়িয়ে দেখুন না আগে।

তাবুর বাইরে এক অপার বিস্ময় অপে'খ'া করে ছিল। উল্লসিত হয়ে বললাম — গিন্নিকেও এ দৃশ্য দেখাতে হবে। দাঁড়ান ওকে ডেকে আনি।

— দেখো, বাইরে এসে দেখো, প্রকৃতি কী চমৎকার সাজে সেজেছে। ভারতীকে বলি।

অপূর্ব শোভা সেই প্রকৃতির! অপরূপ তার সাজ! ভাষায় তা বর্ণনা করা যায় না। আকাশ থেকে এক অলৌকিক রচনা নেমে এসেছে মোহময় এই ভুবনে। স্বর্গ থেকে দিব্যাঙ্গনাসকল অবতীর্ণ হবে বুঝি বা! নিচে মৃদু কলরোলে পঞ্চতরণী প্রবাহিত। চারদিকে নির্বাক নিঃঝুম পাহাড়ে অনন্ত প্রশান্তি অঙ্গাবরণের মতো। ন'খ'ত্রখচিত আকাশ ঝলমল করছে। ধূসর পাথরে পূর্ণ চাঁদের আলো পড়েছে। কোথাও ঝলমল করছে সেই জ্যোৎস্না। কোথাও গোপন অন্ধকার ভেদ করতে ব্যর্থ। পাহাড়ের চূড়ার কাছে আরো বরফ জমছে একটু একটু করে। দুপুরে ছিল যৎসামান্য। এখন বাড়ছে। চন্দ্রালোক সেই শ্বেতশুভ্র তুষারধবলে ঠিকরে পড়ছে। ক্রমশ বাড়ছে আলোর দ্যুতি। এক স্বপ্নময় মায়াবী পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। অগাধ শান্তি নির্জনতা। নদীর তীরে কোলাহলপ্রিয় মানুষেরা এখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

এই তো সময় — পবিত্র মনে প্রস্তরাসনে বসে ধ্যানমগ্ন হওয়ার। আত্মমগ্ন ভাবনার। আত্মসুখের থেকেও বড়ো হল জগতের ভাবনা। পরার্থ ভাবনাই শ্রেষ্ঠ ভাবনা। মহতী মানুষেরা তা ভাবেন। আমরা 'খ'ুদ্র জীবনের হিসাবনিকাশের ভাবনা নিয়ে মশগুল।

নিজেকে বললাম — হে জীবন, ভাবো। কোন কি সৎকর্ম করতে পারলে? তা নিয়ে ভাবো। কোন দুষ্কর্ম করলেও ভাবো। পাপ করলে স্বীকার করো। অন্যায় করলে নিজেকে বলো, অন্যায় করেছি। অনুতাপ করো। কিছু কি করা এখনো অপূর্ণ রয়ে গেল জীবনে? তা নিয়ে ভাবো। ভাবতে বসে দেখি — কিছু করার বিনিময়ে কী কী পেলাম আর কী কী পেলাম না, সবই অনিবার্য নিয়মে এসে পড়ছে। আসুক। সবই জানো — প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তি।

সময় ফুরিয়ে এল আমার। বড্ড দেরি করে ফেলেছি। কত কিছু করার ছিল। তা বুঝি আর করা হয়ে উঠবে না।

তাপস ঘটককে বললাম — অজস্র ধন্যবাদ এমন এক মহান এক দৃশ্য দেখানোর সুযোগ করে দিয়েছেন বলে।

— পিসেমশাই, আমাকে আবার আপনি কেন?

— আচ্ছা সে হবেখন। বলে তাবুর ভিতরে চলে যাই।

অনেক'খ'ণ ধরে ঘুম আসে না চোখে। মানসনেত্রে ভাসছে বাইরের চন্দ্রালোকিত নিসর্গদৃশ্য। কোথায় কোলকাতার কর্মব্যস্ততা আর কোথায় হিমালয়ের গহন প্রদেশে এসে তাবুর ঘেরাটোপে রজনীযাপন।

আগামীকাল পঞ্চতরণী থেকে যাত্রা করব শেষনাগ।

১০। পঞ্চতরণী থেকে পহেলগাঁও

৫ই জুলাই। সকাল। প্রিয় বলল — আমরা এগোচ্ছি পিসেমশাই। চন্দনবাড়িতে দেখা হবে। আপনাদের জন্যে অপে'খ'া করব।

— একেবারে সোজা চন্দনবাড়ি চলে যাবে? পারবে?

— পারব না কেন? এই তো দেখুন না শেষনাগ থেকে গতকাল শুরু করে কেভ ঘুরে আমরা চব্বিশ কিলোমিটার রাস্তা পার হইনি?

সত্যিই তো। গতকাল আমরা চব্বিশ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েছি। তাহলে পঞ্চতরণী থেকে চন্দনবাড়িও তো চব্বিশ কিলোমিটার। হবে না কেন একদিনে? প্রিয়রা বেরিয়ে পড়ল। পিছনে আমরা।

সকাল সকাল যাত্রা করে দুপুরের একটু আগেই পৌঁছনো গেল শেষনাগ। আরেকবার মহাগুনাস গিরিবর্ত্মে পা রাখার সুযোগ হল। প্রিয়রা অনেক আগে আগে চলেছে। পথে আমরা ওদের দেখা পাচ্ছি না একবারের জন্যেও। শেষনাগের হোলি কেভ টেন্টে উঁকি মেরে দেখি আমাদের চেনাজানা কেউ নেই। সব শুনশান।

একটু পরে ভারতীর ডাণ্ডি এল। দোকানে বসে চা-পান হল। খিদে পেয়েছে। এখানকার লঙরখানা থেকে হালুয়া-সবজি নিয়ে আসা হল। টাটকা গরমাগরম খাবার। কী সুন্দর বাস তার! কী দারুণ স্বাদ!

শেষনাগ বিদায় জানিয়ে আবার যাত্রা করলাম। হৈহৈ করে এগিয়ে চলেছি। পৌঁছে গেলাম সেই দুর্ধর্ষ পিসুটপে। পাহাড়ি পথে ঘোড়ায় চেপে চড়াই ভাঙা সহজ। সামনের দিকে ঝুঁকে বসতে হয় মাত্র। উৎরাই পথে চলা ভয়ানক বিপদের। পিছন দিকে কাঁহাতক হেলে বসে থাকা যায়? তারপর পিসুটপের মতো খাড়াই পথে?

শাশ্বতীকে বললাম — পাহাড়ি পথে নিচে নামতে তো কষ্ট নেই। গ্রাভিটি আমাদের সাহায্য করবে। সুতরাং ঘোড়া থাক। পায়ে হেঁটে নিচে নামব।

ঘোড়া থেকে নেমে পড়লাম। যুদ্ধজয় করে ফেরা এখন। সমস্ত দুর্গমতা পদদলিত করে চলার সাহস পেয়ে গিয়েছি যেন। আর কাকেই বা ডরাব? অবতরণের সময় পিসু আর ঝামেলা করেনি তেমন করে। আরো খানিকটা এগিয়ে এসে শাশ্বতীকে বললাম — এই সেই ঘাতক জায়গাটা। ওখানে তোমার পিসিমা ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিল। তবু তাকে দমিয়ে রাখা যায়নি। ভাঙা হাত নিয়ে দর্শন করে এসেছে।

দেবদ্যুতির ঘোড়াওয়ালা আমাদের খোঁজে এগিয়ে এসেছে। দেবদ্যুতিরা পৌঁছে গিয়েছে চন্দনবাড়ি। ঘোড়াওয়ালা বলল — সাহাব নে ভেজা। উনলোগ আগে শেড পর আপকো ইন্তজারমে বৈঠে হ্যায়। ডাণ্ডি আয়া নেহি?

— পিছে আনেওয়ালা হ্যায়।

প্রিয় অধীর হয়ে পড়েছিল তার ভগিনীর জন্যে। এত দেরি হচ্ছে কেন? বারবার ঘড়ি দেখছে।

চন্দনবাড়ি পৌঁছে গেলাম বেলা তিনটে নাগাদ। প্রিয়রা ঘন্টা দেড়েক আগেই পৌঁছে গিয়েছে। ভারতীর ডাণ্ডিওয়ালা আবদুল্লারা ঢিমে না দিলে আরো একটু আগে পৌঁছনো যেত। ফেরার সময় ওরা কেন যে এত ঢিমেতালে চলল বুঝতে পারছি না। এক একবার মনে হচ্ছিল আবদুল্লার দল ইচ্ছে করে দেরি করছে। আবার ভাবছি দেরি করেই বা ওদের লাভ কী!

ভারতীর সঙ্গে সঙ্গে সারা'খ'ণ সেঁটে রইল সাধনা। ও প্রায় পাহারা দিয়ে নামিয়ে নিয়ে এল পিসিমণিকে। সাধনা না থাকলে পথের মঝেখানে ওরা ভারতীকে বসিয়ে রাখত কিনা কে জানে! যাই হোক সাধনার কাছে আমাদের এই ঋণ শুধবার নয়। আবদুল্লারা ভেবেছিল ওদের নামে কর্তৃপ'খে'র কাছে আমরা অভিযোগ জানাব। পথে বড্ড দেরি করেছে বোধহয় সেজন্যে। ডান্ডিওয়ালাদের ব্যাপারে আমাদের খানিকটা ে'খে'ভ আছে বটে তবে অভিযোগ জানিয়ে ওদের সমস্যায় ফেলার বাসনা নেই।

আমরা ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে দুটো গাড়ি ঠিক করা হল। চন্দনবাড়ি থেকে পহেলগাঁও পৌঁছে দেবে। প্রথম গাড়িতে উঠল ডাক্তারবাবুর সঙ্গে তাপি, সাধনা, রুমা, অনীতা, কবিতা, দেবদ্যুতি, বিপাশা দেবী। দ্বিতীয় গাড়িতে আমাদের সঙ্গে সবিতা, শাশ্বতী এবং ওর মা। সেই সঙ্গে জনাকয়েক স্থানীয় কাশ্মীরী।

একটু এগোনোর পরেই গাড়ি দাঁড় করিয়ে চেকিং করল সেনারা। আমরা তীর্থযাত্রী বলে গাড়ি থেকে নামতে হয়নি। স্থানীয় লোকদের গাড়ি থেকে নামিয়ে দেহ খানাতল্লাশি করা হল। পরিচয়পত্র দেখাতে হল। এমনি করে বার পাঁচেক চেকিং হল।

এ দেশ কাশ্মীরিদের। আমরা এখানে বরঞ্চ বিদেশী। অথচ স্বদেশে ওরাই কেমন পরবাসীর মতো। ওদের আত্মপরিচয় দিতে হচ্ছে। আমাদের নয়। আশ্চর্য লাগল। আবার তীর্থযাত্রীদের সুর'খ'ার জন্য স্থানীয় মানুষজনের খানতল্লাশিও যে প্রয়োজন সেটা বুঝতে পারছি। কখন কোথায় কোন আতঙ্কবাদী লুকিয়ে থাকছে তা বোঝার উপায় নেই। ওরা তো রক্তপাত ছাড়া আর কিছু বোঝে না। নিরীহ তীর্থযাত্রী বলে 'খ'মা করবে না।

হিলপার্ক হোটেলে পাঁচ তারিখের জন্য আমাদের কোন ঘর বুক করা ছিল না। কারণ সেদিনটায় আমাদের থাকার কথা ছিল শেষনাগে। সেখানে না থেকে একদিন আগে পহেলগাঁও চলে এসেছি। ফলে এই দিনটার জন্যে আলাদা করে আমাদের হোটেলভাড়া গুনতে হবে। পর্যটক সংস্থা দেবে না।

প্রিয় দরদাম করে সেটা ম্যানেজ করল। আর তখনই আবিষ্কার করা গেল যে মিলনরা আমাদের কাছ থেকে ঘরভাড়া হিসেবে অনেক বেশি মূল্য নিয়েছে।

হোটেলের লকার থেকে স্যুটকেস ব্যাগ বার করে যে যার ঘরে চলে গেলাম।

বিকেলে ফোন করা হল কোলকাতায় বাড়িতে। ভালোয় ভালোয় দর্শন করে ফিরে এসেছি আমরা। সে খবর জানিয়ে দেওয়া হল। বাড়ির খবরও পাওয়া গেল। সকলে ভালো আছে। বাড়ি বলতে আমাদের বিশেষ আপনজনদের কথা বলা হচ্ছে। সাকুল্যে কয়েকটি জায়গায় আপনজনদের সে বন্ধন টিকে আছে। কবির রোডে নিখিলের কাছে, রিপন স্ট্রীটে মামণির কাছে, শ্রীরামপুরে পার্বতীদির কাছে আর বেলেঘাটায় তপতীর কাছে। কুঁদঘাটে সুতপা এবং খিদিরপুরের মুন্নাদের সঙ্গেও আমরা অনেক অন্তরঙ্গ। এদের একজনের কাছে খবর দিলে, অন্যদের কাছে আমাদের খবর পৌঁছে যাবে।

দু'দিন পরে জমিয়ে স্নান করা হল। কিছু জামাকাপড় কাচা হল।

হোটেলের পিছনে ছোট্ট বাগান। অনেক রকমের ফুল ফুটেছে। জানালার ঠিক বাইরে। কাপড়জামা মেলতে গিয়ে ভারতী ধুপ করে আওয়াজ শুনতে পেল। দেখে পাশের ঘরের জানালা থেকে শাশ্বতীর মা, রঞ্জিতাদি, নিচের বাগানে ধপাস করেপড়ে গিয়েছেন। ভাগ্য ভালো তেমন চোট লাগেনি।

রাতে প্রিয় বলল — পিসেমশাই আমরা আগামীকাল শ্রীনগর যাবো। যাবেন আপনারা? সকালে বেরিয়ে বিকেলে ফিরে আসব।

— না বাবা এত হইহই করে শ্রীনগর দৌড়নো পোষাবে না আমাদের। কয়েক ঘন্টায় কিছু দেখাও হবে না। দৌড়ঝাপই সার। আমরা যাব না। তাছাড়া শ্রীনগর গুলমার্গ খিলানমার্গ সোনমার্গ যুসমার্গ ওসব আমাদের দেখা। অনেকদিন আগে এসেছিলাম। মৌজ করে বেড়ানো হয়েছিল সেবার। তোমরা যাও।

রাতে দেবদ্যুতি ঘরে এসেছিল গল্প করতে। আমরা শ্রীনগর যাচ্ছি না শুনে বলল — জেঠু আপনাদের সব জায়গাই কি দেখা নাকি?

— শোন, আমাদের বয়সটা কম হল ? কতদিন ধরে বেড়াচ্ছি বলোতো! প্রায় চল্লিশ বছর ধরে। তখন তোমরা জন্মাওনি। বুঝেছ?

ওর চোখে বিস্ময়ের ঘোর। বলল — তার মানে ইন্ডিয়ার সবকিছু দেখে ফেলেছেন?

— দূর পাগলী! সবকিছু দেখা যায় নাকি! তবে অনেক কিছুই দেখেছি।

ওকে বলতে হল শ্রীনগরে কি কি দ্রষ্টব্য আছে। শ্রীনগর বলতে প্রথমেই মনে হয় হাউসবোট শিকারা দিয়ে সাজানো ডাল লেক এবং লেকের ধারে নির্মিত মুঘল গার্ডেনস — শালিমার বাগ, নিশাত বাগ। আর লেকের মধ্যে রয়েছে নেহে(পার্ক, চারচিনার। ডালের পাশে হাজার ফুট উঁচুতে শঙ্করাচার্য মন্দির। অনেক মসজিদ আছে — বিশেষ করে দ্রষ্টব্য হজরতবাল মসজিদ। সেখানে হজরত মহম্মদের পবিত্র কেশগুচ্ছ সংরখি'ত আছে।

প্রিয়রা রসিদভাইকে খবর দিয়ে আনিয়ে গাড়ির ব্যবস্থা করে রাখল। পরদিনের জন্য। শ্রীনগর ঘুরতে যাবে।

মিলনরা পাহাড় থেকে নামেনি আজ। সুতরাং ভারততীর্থ দর্শনের তৈরি রান্না জুটছে না। রাতের ভোজনপর্ব সারতে হবে যার যার পয়সায়। এই সুযোগে ভালো ভালো খাবারের অর্ডার দেওয়া হল হোটেলের কিচেনে। বিশেষ করে দুএকটি কাশ্মীরি খানার লোভ সামলানো গেল না। এতটা পথ হাটাচলা করে এবং পাহাড়ের বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করে দেহমন চাঙা হয়ে উঠেছে। ডায়াবিটিস গুলি মারো। মৌজ করে ভোজন সারা হল ঘরে বসে। সুন্দর রান্না হয়েছিল।

তারপর গভীর ঘুমে ঢলে পড়তে সময় লাগে নি।

১১। পহেলগাঁও শেষ দুদিন

আগের দিন সকালবেলা ডাক্তারবাবু তাপি-সাধনা-রুমা-অনীতা-কবিতা-দেবদ্যুতি-বিপাশারা চলে গেল শ্রীনগরের উদ্দেশে। টাটাসুমো করে।

শাশ্বতীর মা-কাকিমার ইচ্ছে পহেলগাঁওতে বসে একদিন সময় নষ্ট না করে এই সুযোগে বৈষে(াদেবী যদি দর্শন করা যায়। ভোরবেলায় ওকে নিয়ে বাসস্ট্যান্ডে যেতে হল। বাসের খোঁজখবর করতে। তিনজন মহিলা বৈষে(াদেবী যাবে, ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছিল না।

শাশ্বতী বলল — না পিসেমশাই যেতেই হবে। কাকিমার বিশেষ করে ইচ্ছে হয়েছে। তাঁকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়।

বললাম — যাবেই যদি তবে প্রাইভেট গাড়িতে যেও না। সরকারী বাসে যাও।

রাজ্য সরকারের বাস ঘুমটি থেকে জানা গেল সোজাসুজি কাটরার বাস নেই। জম্মুর বাস ধরে যেতে হবে জম্মু। অথবা কাটরা মোড়ে নেমে ওখান থেকে কাটরার বাস ধরতে হবে।

— জম্মুর বাস কখন পাওয়া যাবে?

— এখুনি একটা বাস ছাড়বে জম্মুর। ঐ তো দাঁড়িয়ে আছে। আপনারা যাবেন?

— যাব। কিন্তু হোটেল থেকে জিনিসপত্র আনতে হবে তো। দশ-পনেরো মিনিট সময় লাগবে।

— যদি সত্যিই যান তাহলে দশ মিনিট দেরি করে বাস ছাড়ব।

— হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা যাব। অপে'খ'া করুন একটু।

হোটেলে ফিরে ঝটপট বাক্সবিছানা গুছিয়ে ওরা বেরিয়ে পড়ল বৈষে(াদেবীর উদ্দেশে। হোটেলের গাড়ি ওদের নামিয়ে দিয়ে গেল বাস আড্ডায়। শাশ্বতীকে বললাম — দয়া করে একটা ফোন করে জানিয়ে দিও বৈষে(াদেবী পৌঁছে।

— চিন্তা করবেন না। ওখানে পৌঁছে নিশ্চয়ই একটা খবর দেব।

— যেভাবে যাচ্ছ, চিন্তায় থাকব। তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে ৮ই জুলাই বিকেলে জম্মু স্টেশনে। তাই তো?

— তাই। আসছি। টা টা।

জগতে মানুষই মানুষের পরম মিত্র। আবার এই মানুষই হতে পারে তার চরম শত্রু। সকল ধর্ম শেখায় মানুষকে ভালোবাসতে। মানুষকে আপন করে নিতে। এরা তিনজনে আমার কেউ নয়। পথে চলতে চলতে এদের সঙ্গে চেনাজানা। হয়তো কোলকাতায় কাজের বৃত্তে পড়ে এই পরিচিতিটুকুই শুধু বেঁচে থাকবে। হয়তো কোনদিনই এদের সঙ্গে দেখা হবে না। তবু আজকে এদের বিদায় জানিয়ে ফিরে আসতে আসতে বড়ো দুর্ভাবনা হচ্ছিল। ওদের যাত্রা শুভ হোক এই কামনা ছিল অন্তরে।

হোটেল হিলপার্কে রয়ে গেলাম আমরা দুটি প্রাণী। একে একে সকলেই বেরিয়ে পড়েছে। আমরা বুড়োবুড়ি ভাবতে বসেছি তাহলে শেষ পর্যন্ত অমরনাথ দর্শন হল আমাদের। সত্যিই হোল। এই বৃদ্ধ বয়সে এসে। আমরা কি দেখতে এসেছি এখানে? হিমালয়ের দুর্গম পথ আর অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য? নাকি গুহাকন্দরে কি বিস্ময়ের সঙ্গে গড়ে ওঠে তুষারলিঙ্গ? মানুষ কেন আসে এখানে? দেবতার প্রসন্নতা লাভ করতে? সে প্রার্থনা তো ঘরে বসেই করতে পারত। কালিঘাট-দ(িণেশ্বরে বা কাশী-হরিদ্বারে। এত কষ্ট করে এত অর্থব্যয় করে এখানে কেন?

বিকেলের একটু আগে পাহাড় থেকে নেমে এল অরুণ পাত্র, তাপস ঘটক, মিতালী ঘটক, শীলা ঘোষ, রিনা সরকার এবং সাহেবগঞ্জের দিদি। সেই সঙ্গে মুক্তি, ম্যানেজার এবং অন্যান্যরা।

ওরা ৫ই জুলাই অমরনাথ দর্শন করেছে সেদিনটাই প্রকৃত পূর্ণিমা মনে করে। খুব ভোরে বেড়িয়ে বেলা আটটার মধ্যে পৌঁছে গিয়েছিল মন্দিরে। মিতালীকে ডুলি করে নিচ থেকে উপরে মন্দিরে নিয়ে যেতে হয়েছিল। আগের দিনের তুলনায় দর্শনার্থীদের বিশাল লাইন পড়েছিল সেদিন। কেউ কেউ সকাল নটা-দশটায় লাইন দিয়ে বিকেল বেলায় দর্শন করতে পেরেছে। মিতালী অবশ্য মিলিটারি গেট দিয়ে ঢুকে দেবতার দর্শন করতে পেরেছিল খুব তাড়াতাড়ি। তাপস ঘটক এবং অরুণ পাত্র সেই সুবিধে লাভ করতে পারেনি। সেদিন জম্মু-কাশ্মীরের গভর্নরও হেলিপ্যাডে নেমে অমরনাথ দর্শন করেছেন।

পঞ্চতরণী ফিরে ওখান থেকে ওরা শেষনাগ চলে যায়। রাতটা কাটায় শেষনাগের তাবুতে। পরদিন যাত্রা করেছে পহেলগাঁও। মিতালী ঘোড়ায় চড়েই ফিরতে শুরু করেছিল। কিন্তু ভারী শরীর নিয়ে ঘোড়ায় চড়ার ধকল আর নিতে পারছিল না। ডুলিতে চেপে বসল। পিসুটপ থেকে নামার সময় কালঘাম ছুটে গিয়েছিল নাকি ওর। পিসুটপের চড়াই ভাঙা যেমন কষ্টের, উৎরাই পথে নামাও কম কষ্টকর নয়।

এদিকে বেহালার দুই বোন এবং সাহেবগঞ্জের ভদ্রমহিলা লাইনে দাঁড়িয়ে অমরনাথ দর্শন করে পঞ্চতরণী ফিরে আসেন। ওখানে রাত কাটিয়ে পরদিন যাত্রা করেন শেষনাগের দিকে। সেখানে এসে দেখেন কেউ নেই। আর অপেক্ষা না করে বেরিয়ে পড়েন চন্দনবাড়ির দিকে।

পহেলগাঁও পৌঁছে সকলে যখন শুনল ডাক্তারবাবুরা শ্রীনগর চলে গিয়েছে তখন মনে মনে একটু হতাশ হল। হয়তো ওরাও এই সুযোগে শ্রীনগর দেখতে যেতে পারত। তা হল না। এক যাত্রায় পৃথক ফল হলে মনোবেদনা জন্মানো স্বাভাবিক।

এই অবসরে পহেলগাঁওতে আমরা দুই প্রৌঢ় খুঁজে বেড়ালাম সেই কাঠের পুলটা। লিডারের উপরে সেটা ছিল। পর্যটকদের জন্যে সুন্দর রিসেপশন বাংলো ছিল। আমরা সেখানে রাত্রিবাস করেছিলুম। কোথায় ছিল সেটা? বাজার চক্কর দিয়ে নদীর কাছে গেলাম। মানালীর বিপাশা এবং পহেলগাঁওর লিডারের মধ্যে খুব মিল। তখন রাস্তার বাঁদিকটা নদীতট পর্যন্ত এলাকা সম্পূর্ণ ফাঁকা ছিল। পাথর ছড়ানো উপত্যকা ছিল। সবুজে পাথরে মাখামাখি করে। কোন ঘরবাড়ি ছিল না এদিকটায়। এখন মিলিটারি হাসপাতাল হয়েছে, কত হোটেল দেখা যাচ্ছে, অনেক দোকানপাট-বাজার হয়েছে। বড্ড ঘিঞ্জি হয়ে গিয়েছে জায়গাটা। এর নামই তো উন্নতি।

লিডারের সঙ্গে যে মিতালী সেদিন সহজে হয়েছিল আমাদের, আজ আর তা অন্য কারো সঙ্গে হওয়ার নয়। আমরা তখন বেগবতী নদীর পাথরে পাথরে কত নেচে বেরিয়েছি। নদীর মতো উচ্ছল আনন্দে। নদীর উপর ছড়ানো উপলখণ্ডে বসেছি খরস্রোতা শীতল

জলে পা ভিজিয়ে। গান গেয়েছি আপন আবেগে। ভাঙা গলায়। আবার নীরবে কান পেতে শুনতে চেষ্টা করেছি নদীর কথা। নির্জনতার ভাষা। চারিদিকে সবুজ পাহাড়ি ঢল। দীর্ঘকায় বৃখ'রাজি। তার ছায়ায় ছায়ায় হেঁটেছি কতো! ফুলের সমারোহ দেখেছি। সেসব আর নেই।

আজকাল আর কেউ লিডারের কাছে যায় না। কেউ গিয়েছিল কিনা জানি না। কাউকে একবারও তো দেখলাম না নদীর কাছে গিয়ে বসতে।

রাতে ফিরে এল প্রিয়রা। শ্রীনগর ভ্রমণ তেমন সুখকর হয়নি ওদের। শহরে কারফিউ জারি করা হয়েছিল। পথঘাট নির্জন — লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে। চড়া রোদে ডাল লেকে শিকারা নিয়ে বেরিয়েছে বটে তবে তেমন করে জমিয়ে উপভোগ করতে পারেনি।

দেবদ্যুতি বলল — জানেন তো পুরো ডাল লেকের জলে সবশুদ্ধ তিনটে শিকারা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। শীতের কাশ্মীরে শীত নেই একফোঁটা। তেষ্টায় খুব কষ্ট হচ্ছিল। থাকতে না পেরে লেকের জল আজলা করে খেতে গিয়েছি, ডাক্তারবাবু বারণ করলেন। বললেন — এই মেয়েটা এই জল খেয়ে মরবি নাকি! বোটে করে আইসক্রিম বিক্রি করছিল। তা দিয়ে তেষ্টা নিবারণ করা হল।

— কি কি দেখা হল? মোগল গার্ডেন, শালিমার বাগ। শঙ্করাচার্য মন্দিরের উপর উঠেছিলাম। সেখানে মিলিটারি ক্যাম্প বসেছে। সেনায় সেনায় ছয়লাপ। জায়গাটা অবশ্য দারুণ, না? শহরের দৃশ্য যা চমৎকার দেখা যায় উপর থেকে। কবিতাদির একজন চেনা শালওয়ালা শঙ্করাচার্যের মন্দিরের নিচে অপেক্ষা করছিল। হজরতবাল থেকে শিকারা নিয়ে ডাল লেক বেড়ানোর ব্যবস্থা সেই করে দিয়েছিল। প্রায় আড়াই ঘন্টা ধরে জলবিহার করেছি। তারপর প্রবল বিক্রমে কেনাকাটা করেছি। দেবদ্যুতির রিপোর্ট।

একদিনে আর কতটা দেখা সম্ভব? তবু যতটা হয়! লোকের কাছে বলতে পারবে শ্রীনগর দেখেছি। প্রিয় অখুশি নয়। ও বলল — ভালোই তো বেড়িয়েছি।

পরদিনটা পহেলগাঁওতে কাটাতে হচ্ছে। শুয়েবসে বিশ্রাম করে। অলস মায়ায় সময় কাটিয়ে। এখানে কোন ব্যস্ততা নেই আমাদের। শান্ত নির্জনতা ছড়িয়ে আছে চারদিকের পাহাড়ে, সবুজ বনানীতে।

চলাচলের পথের ধারে কালভার্টের কাছে দুজন কাশ্মীরি বসেছিল। শাল-আলোয়ানের পসরা নিয়ে। খুব করে ধরেছে শালটাল দেখার জন্যে। বললাম — ভাই আমরা কিছুই কিনব না। শুধু শুধু আমাদের দেখিয়ে তোমাদের সময় নষ্ট করবে কেন? তোমরা অন্য গ্রাহক দেখ।

— বাবুজি, দেখনে মে ক্যা হরযা। লেনা জ(রী নেহি। আপ দেখিয়ে তো সহি। কাশ্মীরমে তিন চিজ বহুৎ মিলতে হ্যায়। বিলকুল ফ্রি। কুছ কিমত নেহি দেনা পড়েগা উসকা লিয়ে। এক তো পানি, দুসরা মৌসম, অওর তিসরা দেখনা। যিতনা চাহে আপ পানি পি সেকতে হ্যায়। যিতনা চাহে আপ শ্বাস লে সেকতে হ্যায়। অওর যিতনা দিল চাহে আপ জি ভরকে দেখ সেকতে হ্যায়। আপকো কোই কিমত দেনা নেহি পড়েগা। সমঝ রহে না আপ?

বেশ সুন্দর কথাগুলো বলল বটে। এ দেশের মানুষজন ভারী সুন্দর দেখতে। সাধারণ গরীব ঘরের ছেলেমেয়েরাও দারুণ সুইট। ফর্সা রঙ, লাল টুকটুকে গাল-ঠোঁট। এদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলাম। বাড়িতে কে কে আছে। ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শেখে কি না! রোজগারপাতি কি করে হয়? এই সব আর কি!

ওরা জানাল — দেশের হালত অত্যন্ত খারাপ। ব্যবসা-বাণিজ্য নেই বললেই চলে। বেরোজগারী অত্যন্ত বেশি। পড়াশোনার কথা বাদ দিন। খেয়েপড়ে কী করে বাঁচব তাই জানি না। আমাদের জীবন কাটানোই বড়ো সমস্যা।

ইচ্ছে ছিল জানতে — তোমরা ইন্ডিয়ায় সঙ্গে থাকতে চাইছ না পাকিস্তানের সঙ্গে? পাকিস্তানের তুলনায় ইন্ডিয়া অনেক বড়ো এবং সমৃদ্ধ দেশ। তার সঙ্গেই তো থাকা ভালো। ওরা সেসব রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেল। শুধু বলল — তখতে যারা বসে আছে, তাদের এক রকম সমস্যা। আমাদের অন্য রকম। হামলোগকো জিন্দা রহনা সবসে আগে। জিন্দা রহনা!

ব্রেকফাস্ট সেরে সকলে মার্কেটিং করতে বেরোল সকলে। আমরা একপ্রস্থ ঘুরেছি আগেই। আবার ওদের সঙ্গী হলাম। দোকানে দোকানে ঘুরে খুব কেনাকাটা হল। প্রিয় এমন দরদস্তুর করতে পারে যে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। দোকানীদের মরশুম খুব খারাপ যাচ্ছে। পর্যটক নেই। বাজার মন্দা। ওরা এত সস্তায় জিনিস বিক্রি করছিল যে ভাবাই যায় না। অনেক সময় আমদানির তাগিদে সস্তায় বিক্রিবাটা করতে হয়। সকলেই প্রায় ট্যাঁক খালি করে কিনতে লেগে গেল।

আমাদের ভাঁড়ে মা ভবানী। সন্দীপ্তর জন্যে একটা সুন্দর চামড়ার জ্যাকেট দেখেছিলাম। খুব পছন্দ হয়েছিল। কিনতে পারিনি। এক ডজন চাবির রিং কেনা হল পহেলগাঁওর স্মারক হিসেবে। সেই সঙ্গে কিছু কাজুবাদাম আর ছোট্ট এক কৌটো জাফরান।

বিকেলে আবার বেরিয়ে পড়েছি। ইচ্ছে পাহাড়ে চড়ার। সেনা-জওয়ানরা আপত্তি জানাল। নিরাপদ নয় ওভাবে ঘোরা। হোটেলের বাইরে ছোট ছোট পাহাড় দেখা যাচ্ছে। দেবদ্যুতির খুব ইচ্ছে একটু উপরে ওঠার। ভারতী নিচে রইল। আমরা দুজনে পায়ে

পায়ে উপরে উঠলাম। বড়ো বড়ো সরলবর্গীয় বৃ'খ'রাজি। সবুজ আস্তরণ। এখানে ওখানে ঝোপঝাড়। এলোমেলো ঘুরে বেড়ানো গেল একটু। বেশি দূরে যাইনি। সেনাদের নিষেধ আছে। ওরা উল্টোদিকের টিলায় যে আস্তানা গেড়েছে সেখান থেকেই আমাদের নজর রাখছে।

ফেরার সময় একজন জওয়ান গল্প জুড়ে দিল। পাতি বাংলায় বলল — আপনারা বাঙালি তো? দেখেই বুঝেছি।

— অ্যা! আপনারা বঙ্গসন্তান? এতদূরে পহেলগাঁওতে কেন?

— কি করব চাকরি। ওহ, বাংলায় কথা বলতে পেরে যেন দম পাচ্ছি।

মাতৃভাষায় এই এক জ্বালা। বললাম — হোটেলে আসুন গল্প করা যাবে। আরো অনেকে আছে আমাদের দলে।

ডিউটির পরে দুই জওয়ান হোটেলে এল। একজনের দেশ মুর্শিদাবাদ। দেশের নাম শুনেই রুমা লাফিয়ে উঠল। বলল — মুর্শিদাবাদে কোথায়?

— বহরমপুরে। অর্থাৎ রুমার দেশের লোক। দূরদেশে দেশের লোকের দর্শন পাওয়া মহা সৌভাগ্যের কথা!

কোলকাতায় কে যেন ফোন করেছিল। সেই সূত্রে জানা গেল যে জম্মুর পথে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ হয়েছে। কোলকাতা পর্যন্ত সে খবর চলে গিয়েছে মানে ব্যাপারটা বহুদূর গড়িয়েছে। আমরা হোটেলে বসে আছি বলে টের পাচ্ছি না। আগামীকাল আমাদের ফিরে যাওয়ার কথা। কোন ঝামেলা হবে না তো? রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে না তো? ফেরা নিয়ে কোন সমস্যা হবে কিনা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। জঙ্গীহানার আশঙ্কা থাকলে সেনারা পথ বন্ধ করে দিতে পারে। আমাদের ফেরা তাহলে পিছিয়ে যাবে। নতুন করে ট্রেনের টিকিট পাওয়া খুবই কঠিন কাজ। পুঁজিতেও বেজায় টান।

অনীতা ভয়ে দুর্ভাবনায় কান্নাকাটি জুড়ে দিল। কান্না মানে অঝোরে কান্না। কোন সান্ত্বনা দিয়েই থামানো যাচ্ছে না। বলছে — কেন এলাম মরতে এই পথে? না এলেই ভালো হত। এখন কী হবে!

সকলেই কমবেশি বিমর্ষ। মনমরা। শুকনো মুখে একজন আরেক জনকে সান্ত্বনা দিয়ে যাচ্ছে। যা হবার তা হবে। আগেভাগে ভেবে কি করব? ভাগ্যে যা লেখা আছে তাই তো হবে। নিয়তি কে খণ্ডাবে?

দলের মধ্যে আমরাই বৃদ্ধ। সংসারের দায় নেই, পিছুটান নেই। তাই মরণভয়ে ভীত হওয়ার জোরালো কারণ নেই। অমরনাথ যখন যাত্রা করেছি তখন জানি এমন কোন না কোন দুর্বিপাকে পড়তে হতে পারে। কাশ্মীর মানেই সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গী আন্দোলন। যে

কোন মুহূর্তে একে-৪৭ রাইফেলের তুমুল বর্ষণ অথবা গ্রেনেড বিস্ফোরণ। তা জেনেই তো এ পথে পা বাড়ানো।

অতীতে অমরনাথ দর্শনে এইসব উপদ্রব ছিল না। পথঘাট হয়তো আরো দুর্গম ছিল। যাতায়তের সুযোগ সুবিধা ছিল কম। এই জঙ্গীপনা ছিল না। গত দশ পনেরো বছর ধরে যা ধাপে ধাপে বেড়েই চলেছে। আমরা জেনেশুনেই এসেছি। এখন খামোখা ভয় পেয়ে কান্নকাটি করে লাভ কী! সংসারী মানুষের কথা অন্যরকম। তাদের বেড়ানো চাই। আবার বাড়িতে স্বামীস্ত্রী পুত্রকন্যা ফেলে এসেছে তাদের জন্যে উতলা হওয়াও চাই। কোনটাই বর্জন করা চলে না।

দেশের সাধারণ মানুষ মনে হয় ঠিক এরকম পরিস্থিতিটা চায় না। তাদের প্রাথমিক চাহিদা জীবনধারণ করা। বেঁচে থাকা। তারপর রাজনীতি-জাতীয়বাদ-ধর্ম-ভাষা ইত্যাদির সঙ্কট নিয়ে ভাবনা।

কাশ্মীর নিয়ে দুদেশের এই টানাপোড়েন কোনদিন শেষ হবে না বলেই মনে হয়। আমরা ভারতীয়রা কাশ্মীর ভূখন্ডকে আমাদের দেশের অঙ্গ ভাবতেই পছন্দ করি। কে চায় রাজ্যের অঙ্গহানি! কিন্তু কাশ্মীরি মানুষেরা যদি আমাদের সঙ্গে বসবাস করতে না চায়, তবে তো আমরা নাচার।

মুসলমান হলেও কাশ্মীরের সুফীধর্ম উদার প্রকৃতির ছিল। একদা শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে কাশ্মীরিরা রাজাকার বাহিনী ঠেকাতে ভারতীয় সেনাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল। আজ তাদের একাংশ কেন ভারতীয়দের ঘৃণা করতে শিখেছে? এর সবটাই পাকিস্তানের দুর্বুদ্ধি বলে ব্যাখ্যা করলে হবে তো? আমাদের কোন গলদ নেই তো? সমগ্র ভারতের আঞ্চলিক বিকাশও সমানভাবে হয়নি। অসম বিকাশের ফলে অনেক এলাকার মানুষের মনে খোঁভ জমেছে। নেতৃবর্গের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও সততা কম। তাৎখণিক 'খু'দ্র স্বার্থবোধই চালিকাশক্তি। তারই বিষময় ফল ফলছে সর্বত্র।

সেদিন আমরা মিলন মুখার্জি প্রসেনজিৎ দুজনের উপর খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলাম। বিশেষ করে মিলনের উপর। প্রথম থেকে বলে এসেছিলাম ঘোড়া-ডাণ্ডির জন্যে মানি-রিসিপ্ট্ দিতে হবে। ওরা আজ দেব কাল দেব করে গেল কদিন ধরে। দিল না। শেষ পর্যন্ত দিতে পারবে বলেও আর মনে হচ্ছে না। তবে বাজে কথা বলল কেন? এই বাজে কথা বলাটাই অসহ্য। কথা দিলে তা রাখার দায় থাকবে না? তাহলে মানুষ হিসেবে গণ্য হওয়ার যোগ্যতাই থাকে না যে। আসলে কে আর মানুষ হওয়ার যোগ্যতার জন্য খাবি খাচ্ছে! সবাই তো করে খেতে ব্যস্ত।

রাতে পর্যটক সংস্থার তরফ থেকে মহাভোজের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। আমাদের অরুণ পাত্র স্বহস্তে ফ্রায়েড রাইস রান্না করেছিল। রন্ধনশিল্পে তার বিশেষ আগ্রহ আছে বোঝা যাচ্ছে। 'খু'ব্ধ হয়ে ডিনার বর্জন করব বলে ঠিক করেছিলাম। তখন মিলন

মুখার্জি এসে অনেক অনুরোধ করে আরো এক প্রস্থ প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেল। আরো খানিকটা আস্থা রাখতে বলে গেল। ও সাহিত্যজগতের একজন নামকরা সাহিত্যিকের ভ্রাতুষ্পুত্র। কেন যেন মনে হয়েছিল ও আর পাঁচজনের মতো নয়। আসলে ভুলই ভেবেছিলাম।

খাদ্য যত সুখাদ্যই হোক মনমেজাজ যথাযথ না হলে সুস্বাদু ঠেকে না। ডিনারের পরে বকশিশ চাইতে এসেছিল কর্মচারীর দলবল নিয়ে বীরেনরা। রাগ করে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিয়েছি। মিলনদের প্রতিশ্রুতি দেশের রাজনীতিজ্ঞদের মতো। ওটা দিতে সময় লাগে না কেননা পালন করার কোন সম্ভাবনা নেই। প্রিয় ঠিকই বলেছিল — পিসেমশাই আপনি ভুল করেছেন। পুরো টাকা না দিলে এরা রিসিপ্ট্ দিতে বাধ্য হত।

কথাটা ঠিকই হয়তো। মুস্কিল হচ্ছে মানুষকে সহজে বিশ্বাস করে ফেলি আমরা। ভদ্রসন্তান যদি কথা দেয় তা সে রাখবে বলেই মনে করি। ভুলই করি। অবশেষে পস্তাই। বহু'খে'ত্রেই এমন ঘটেছে। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন পর্যন্ত অম্লানবদনে ব্লাফ দিয়ে গিয়েছে।

১২ । প্রত্যাবর্তন

৮ই জুলাই। পহেলগাঁও থেকে জম্মু ফেরার দিন। খুব সকাল সকাল যাত্রা করতে হবে। পথে জঙ্গীদের আনাগোনার কথা শোনা যাচ্ছে। যতো তাড়াতাড়ি পাহাড় থেকে নেমে পড়া যায় ততই বাঁচোয়া।

খুব সকালে বাস এসে গিয়েছে। হোটেলের সামনে অপে'খা করছে। স্নান সেরে বাক্স পেটরা নিয়ে বাসে চেপে বসেছি। সকলেই ঝটপট তৈরী হয়ে নিয়েছে। কারণ প্রত্যেকের মনে ভয়। পালাতে হবে — জলদি।

শহর ছাড়িয়ে প্রান্তবর্তী বেসক্যাম্প পর্যন্ত এসে পৌঁছেছি সবে। আবার দুঃসংবাদ। গাড়ি আর যাবে না। সিক্যুরিটি গেট আটকে দিয়েছে। কেন? না, পথে আতঙ্কবাদীদের মাইন পাতা রয়েছে বলে খবর এসেছে। গোটা পথ পরী'খা করে মাইন থাকলে তা নিষ্ক্রিয় করে তবে বাস ছাড়া হবে।

বুকভরা উদ্বেগ আর আশঙ্কা নিয়ে সকলে বসে রইল বাসের মধ্যে। আমার উদর ঠিকমতো কাজকর্ম করছে না। অবশ্য কোনকালেই তা খুব দ'খ'তার সঙ্গে কাজ করতে পারেনি। হজমের গোলমাল নিয়ে অনেককাল আছি এবং সেসব নিয়েই বিদায় নিতে হবে। এমন সঙ্কটজনক অবস্থায় দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। জঙ্গী, বাসের ঝাঁকুনি এবং পেটের গোলমাল — ত্রয়ীর যোগাযোগে আধমরা আছি। জঙ্গীহানার থেকেও ভয় বেশি পেট গুড়গুড়োনির।

বেলা নটা নাগাদ যাত্রার ছাড়পত্র মিলল। বাসের ইঞ্জিন গর্জন করে উঠল। ড্রাইভারকে বলা হল কোথাও বাস থামাতে হবে না। সোজা জম্মু। স্পিডে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। পথে একদম দেরি করা চলবে না। বানিহালে নতুন করে অশান্তি না হলেই বাঁচি। পেটের অশান্তি তত'খ'ণে চুকেছে বলেই মনে হচ্ছে।

দুরন্ত বেগে বাস ছুটল। কপাল ভালো পথে আর কোন বিপদ হয়নি। বানিহাল টানেল পার হতেও কোন অসুবিধা হল না। কাজিকুণ্ডতে শুধু বাস একবার দাঁড়াল চা-জলখাবারের জন্যে। মিনিট দশেক।

জম্মু পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যা নামল।

স্টেশনে এসে জানা গেল ট্রেন ছাড়তে দেরী হবে। নির্ধারিত সময় রাত দশটা পাঁচ মিনিট। কিন্তু হাওড়া থেকে আপ হিমগিরি এক্সপ্রেস এসে পৌঁছয় নি তখনো। ফলে ট্রেন ছাড়তে অনেকটাই দেরি হবে। কতটা দেরি হবে, তা আপ ট্রেন না আসা পর্যন্ত বলা যাবে না। আশার কথা এই মাত্র যে দেরি হলেও ট্রেন শেষ অবধি ছাড়বে। যাত্রা সম্পূর্ণ বাতিল করা হচ্ছে না।

আমাদের এবং তাপস ঘটকদের এসি-টিকিট কনফার্ম হয়েছে। সুতরাং স্লিপার টিকিটগুলো ফেরত দিতে হবে। লাইন লাগিয়ে কিছু অর্থদণ্ড দিয়ে টিকিট রিটার্ন করা হল। ফিরে আসতে তাপসের প্রশ্ন — পিসেমশাই, কত পেয়েছেন? আমি তো পুরো টিকিটের টাকা ফেরত পেলাম।

— কি করে পাওয়া গেল? ভারী আশ্চর্য তো!

— হু হু রাস্তা আছে। জানতে হয় সেসব। আমাকে রেলের অফিস থেকেই একজন বলে দিয়েছিল যে ট্রেন ছাড়তে চার ঘন্টার উপর দেরি হলে আপনি জার্নি বাতিল করতে পারেন। তখন আপনি পুরো টাকা ফেরতের জন্যে দাবী করবেন। ওরা পুরো টাকা ফেরত দিয়ে দেবে।

স্টেশনের বাইরে চত্বরে মুক্তআকাশের নিচে বীরেনরা রান্নবান্না করছিল। ওখানেই আমাদের মালপত্র সব ডাঁই করা রয়েছে। লাগেজ ঠিকঠাক আছে কিনা ঘুরে দেখে এলাম।

ইতিমধ্যে শাশ্বতীরা এসে পড়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম — কেমন বেড়ানো হল বৈষে(াদেবী?

— ভালো। দর্শন হয়েছে সুন্দর। কিন্তু বৈষে(াদেবী যাওয়ার পথে খুব বিপত্তি হয়েছিল। জানেন তো পহেলগাঁও থেকে আসার সময় সারা বাসে আমরা তিনজন ছাড়া আর দুটি ছেলে মাত্র সওয়ারি ছিলাম। একজন আবার বাড়ি থেকে পালাচ্ছে। খুব ভয় করছিল তখন।

— তাতে তোমাদের কী?

— শুনুন না কী হয়েছিল। আগের দিন বানিহালের কাছে জঙ্গীহানায় এক সেনা নিহত হয়েছে। রাস্তা বন্ধ। তার লাশ পড়ে আছে রাস্তার ওপর। ফলে সতর্কতা চূড়ান্ত রকমের। হেলিকপ্টারে উপরওয়ালারা সব নামল, তদন্ত হল, তারপর ডেডবডি সরানো হল এবং রাস্তা খুলল। তখন শু(হল বৃষ্টি। আমরা কাটরা পৌঁছেছি তো পুরো ভিজে জবজবে হয়ে। তবে দেবী দর্শন হয়েছে ভালো করে।

— সব ভালো যার শেষ ভালো। এক যাত্রায় বেড়িয়ে অমরনাথ এবং বৈষে(াদেবী দর্শন নিঃসন্দেহে বিরল অভিজ্ঞতা।

প্রিয়রঞ্জন রেলের লোকজন ধরে আপার ক্লাস বাথ(ম সাফসুতরো করে ফেলেছে। তারপর মৌজ করে স্নানটান সেরে নিল। ছেলেটা পারেও বটে। এত ঘাতঘোত জানে! পরিষ্কার বাথরুম পেয়ে আরো অনেকেই স্নান সেরে নিল। একটু পরে খাবার সার্ভ করে গেল বীরেনরা। খেয়েদেয়ে চাদর পেতে শুয়ে পড়ল কেউ কেউ। আমি ঝিমুতে পারি। ঘুমোতে পারি না।

রাত বারোটায় খবর হল যে ৩০৭৪ ডাউন জম্মু-হাওড়া হিমগিরি ছাড়বে। স্টেশনে ট্রেন দেওয়া হবে একটু পরে।

ওয়েটিং হল থেকে ব্রিজ পার হয়ে প্ল্যাটফর্মে সবাই জড়ো হয়েছি। আমাদের কোচ কোথায় পড়বে? আমরা অপে'খ'া করছি সামনের দিকে। মালপত্র ট্রলিতে করে বয়ে আনা হয়েছে। সেসব রয়েছে পিছনের দিকে। জানা গেল কোচ পিছনেই পড়বে। ছুটে গেল সকলে। যে যার লোটবহর বুঝে নিচ্ছিল ট্রলি থেকে। গাড়ি সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। উঠতে যাবো।

হঠাৎ অনিতা বলল — আমার স্যুটকেশ কোথায়? নেই তো।

— সে কী! ভালো করে দেখুন। নিচে রয়েছে কিনা! প্রসেনজিৎ উত্তর দেয়।

খোঁজ খোঁজ। না, অনীতার একটা স্যুটকেশ পাওয়া যাচ্ছে না। নেই মানে নেই। সত্যিই নেই। সবার মালপত্র ঠিক আছে ওর নেই কেন?

কারো সঙ্গে অদলবদল হয়নি তো? না, তা হয়নি।

বাস থেকে সব স্যুটকেশ নামানো হয়েছিল তো? মিলন-প্রসেনজিৎ বলছে — হ্যাঁ। বাস ভালো করে চেক করা হয়েছে। দুবার দেখা হয়েছে। ওখানে কোন ব্যাগ ছিল না।

তবে কি রাস্তায় পড়ে গেল বাস থেকে? সেও তো প্রায় অসম্ভব। ওর একটিমাত্র ব্যাগ পড়ে যাবে বাকি সব ঠিকঠাক থেকে যাবে। অবাস্তব ঠেকছে না?

অনীতা স্যুটকেশ হারনোর শোকে কান্নাকাটি শু(করে দিল। উন্মাদিনীর মতো। শ্রীনগর-পহেলগাঁও থেকে প্রচুর জিনিস কেনাকাটা করেছিল ও। সে সব ওই স্যুটকেশে ঠাসা ছিল। অনেক টাকার জিনিস। শখ করে কেনাকাটা করেছিল বাড়ির সকলের

জন্যে। দুঃখ তো হবেই। অঝোরে কান্নাকাটি করছে মেয়েটা। বলছে — কোলকাতা ফিরে যেতে পারব না। পহেলগাঁও যাব। কেউ সঙ্গে না যায় আমি একাই যাব।

ওকে বোঝাচ্ছে কবিতা — দিদি, তুই পাগল হলি? এখন পহেলগাঁও যাওয়া যায়? দেখলি না জঙ্গী ঝামেলা কিরকম। ভুলে যা ওসব। মনে কর কিছু কিনিস নি।

কে কার কথা শোনে! অনীতা কেঁদেই চলেছে। কে যাবে এখন ওর সঙ্গে পহেলগাঁও? ফেরার ট্রেন সামনে দাঁড়িয়ে। ওকে অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে ট্রেনে চাপানো হল। ট্রেনে বসে প্রিয় বোঝালো। শাশ্বতী বোঝাল। ভারতীও স্তোকবাক্য দিল অনেক।

— দেখ, জিনিস গেলে জিনিস হবে, জীবন গেলে জীবন হবে না। দর্শন করে অ'খ'ত শরীরে ফেরা যে যাচ্ছে, সেটাই তো অনেক। মনে কর কিছু অর্থদণ্ড গেল। তো গেল। কী আর করা? এই তো যাওয়ার পথে পড়ে গিয়ে আমার হাত ভাঙল। কি করা যাবে তার জন্যে, বল। এসব তো কিছুটা মেনে নিতেই হবে।

রাত আড়াইটে নাগাদ জম্মু থেকে ট্রেন ছাড়ল। যে যার মতো গুছিয়ে বসেছি। অনীতা কোথাও স্থির হয়ে বসতে পারছে না। শুধুই কেঁদে চলেছে। একবার এর কাছে একবার ওর কাছে। কবিতা বারবার ওর দিদিকে বোঝাচ্ছে — জিনিসের জন্যে কাঁদছিস কেন তুই! তুই আমার জিনিস সব নিয়ে নে।

মাঝপথে কোন এক স্টেশন থেকে পহেলগাঁওর হোটেল হিলপার্কে ফোন করা হল। জানা গেল যে অনীতা ওর স্যুটকেশ ঘর থেকে বারই করেনি। ঘরে কাবার্ডের ভিতর ফেলে রেখে চলে এসেছে। হোটেলের বেয়ারারা দেখতে পেয়ে ম্যানেজারের কাছে সেটা জমা করে দিয়েছে।

স্যুটকেশ আছে? অনীতার মুখে এত'খ'ণে হাসি ফুটল। সত্যি স্যুটকেশ পাওয়া গিয়েছে? দারুণ খবরটা সকলকে জানানো হল। কী কাণ্ড দেখ মেয়ের! স্যুটকেশ হোটেলে ফেলে চলে এসেছে। মাঝখান থেকে ঝাড় হল মিলন-প্রসেনজিতের। ভালো হোটেল বলতে হবে, স্যুটকেশ আছে তা স্বীকার করে নিয়েছে। পরে কাউকে দিয়ে আনানোর বন্দোবস্ত করা যাবে নিশ্চয়ই।

ট্রেনে প্রথম রাতটা কাটল। সকালবেলা আমাদের কামরা প্রায় ফাঁকা।

শাশ্বতীর মা রঞ্জিতাদি এলেন গল্প করতে। ওনার কর্তা রিটায়ার করেছেন। ইনকাম ট্যাক্স থেকে। তিন মেয়ে। মেজ মেয়ের বিয়ের জন্যে চেষ্টা চলছে। লেখাপড়ায় সে ভালো, অনেক গুণ তার। বড়ো মেয়ে শাশ্বতী বিয়ে করতে চায় না। ভালো প্র্যাক্টিস আছে এবং সদাব্যস্ত। শাশ্বতীকে দেখে ভালো লাগল। স্বাবলম্বী ও স্বাধীনচেতা মেয়ে। অনাবশ্যক মেয়েলীপনা নেই — এটাই ওর ব্যক্তিত্বের আকর্ষণীয় দিক।

আম্বালায় কামরা আরো ফাঁকা হয়ে গেল। পরিত্যক্ত একটি হিন্দি খবরের কাগজ

পেয়ে হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছি। কটা দিন দেশের খবর কিছুমাত্র জানি না। অন্যজগতে অন্যভাবনায় বিভোর থেকেছি। হিন্দি সংবাদপত্র থেকে কি সংবাদ উদ্ধার করতে পারব? চেষ্টা করে দেখা যাক হিন্দি পড়তে পারি কিনা।

জলন্ধর থেকে প্রকাশিত ওই পত্রিকার নাম 'দৈনিক জাগরণ'।

কাগজের ভিতরের পাতায় রঙিন ছবি দিয়েছে অমরনাথ যাত্রার। একজন মহিলা যাত্রীকে নিয়ে ডাণ্ডি চলেছে দর্শনে। চারজন বাহক তাকে বহন করছে। কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে বাহকদের।

হ্যাঁ ঠিক তাই। এরা তো ভারতীর ডাণ্ডিওয়ালারা। তারপর চোখ পড়ল ডাণ্ডির সওয়ারি মহিলার দিকে। আরে এ যে ভারতী। ঐ তো হাতভাঙা অবস্থায় বসে আছে। মাথায় টুপি পড়ে। সোয়েটারের রঙটা, হ্যাঁ ঠিকই আছে। ভারতীরই ছবি, কোন সন্দেহ নেই।

বললাম — দেখেছো, তোমার ছবি ছেপেছে কাগজে।

— আমার ছবি? কই দেখি।

সবাই শুনে হুমড়ি খেয়ে পড়ল — পিসিমণির ছবি? দেখি দেখি।

— এই দেখ।

একেই বলে ভিআইপি হওয়া। হাত ভেঙে এমন ভিআইপি হয়েছে যে খবরের কাগজে ছবি পর্যন্ত উঠে গেল।

খানিকটা হৈচৈ করে কাটল এ নিয়ে। কী আশ্চর্য কো-ইন্‌সিডেন্‌স্ — সমাপতন! হঠাৎ কৌতূহল বশে হিন্দি কাগজটা নাড়াচাড়া করতে গিয়েই না জানা গেল ব্যাপারটা। নয়তো জানার কথাই নয়। কোনদিন আমাদের কারো চোখেই পড়ত না। একে কি নিয়তি জাতীয় কিছু বলা যায়?

দেবদ্যুতি স্লিপার কোচে চড়ে ফিরছে। বারকয়েক ওকে দেখে এসেছি। দরজার পাশেই আপার বার্থে জায়গা ওর। সবথেকে জঘন্য বার্থ ওটা। পাখা প্রায় চলছে না। টিমটিম করে আলো জ্বলছে। উপর থেকে একবারও নামে নি নিচে। খাওয়াদাওয়া নেই। টয়লেটে যাওয়ার তো প্রশ্নই নেই। দুরবস্থা দেখে মায়া হল।

ভারতীকে বললাম — ওকে নিয়ে আসছি এখানে?

বেনারসে ভোর হল। একটু পরে মোগলসরাই। স্লিপার কোচ থেকে দেবদ্যুতি চলে এসেছে আমাদের কোচে। পুরো দলবলের মধ্যে এসে যেন হাতে স্বর্গ পেল। বারবার বলছিল — যে অবস্থায় ছিলাম তা অবর্ণনীয়। অ(ণ পাত্র আর সাহেবগঞ্জের দিদি রয়ে গেল স্লিপারে মিলন-প্রসেনজিৎদের দলের সঙ্গে।

সেদিন বীরেনদের বকশিশ না দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম। বর্ধমানে ওদের ডেকে বখশিশ বাবদ কিছু টাকা দিয়ে দিলাম।

বর্ধমান ছাড়িয়ে একটু এগোলে শাশ্বতীর মোবাইলে বেলেঘাটার বাড়িতে ফোন করলাম। নিখিলকে পাওয়া গেল। বললাম — ফিরছি, তবে অনেক রাত হবে। দরজা যেন বন্ধ না হয়!

হাওড়া পৌঁছতে প্রায় মধ্যরাত। এত রাতে ট্যাক্সি নিয়ে নিজের শহরে চলাও বিপজ্জনক। প্রিয়র গাড়ি এসেছে। বেহালার ভগ্নীদ্বয়কে তুলে নিতে গাড়ি নিয়ে তাদের আত্মীয়রা এসেছেন। রুমার সঙ্গে পাত্রবাবু চলে গেল ট্যাক্সি নিয়ে। তাপস ঘটক গাড়ি পেয়ে গেল দ'খি'ণেশ্বরের।

স্টেশনে দেবদ্যুতির গাড়ি এসেছিল। ফুলবাগানে ওদের বাড়ি। ও আমাদের বাড়ির দরজায় নামিয়ে দিয়ে চলে গেল।

অবশেষে অমরনাথ দর্শন করে আমরা সশরীরে কোলকাতায় ফিরে আসতে স'খ'ম হলাম। এরপর আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবদের কাছে বিশেষ সমাদৃত হতে শু(করেছি এবং দর্শনীয় হয়ে উঠেছি। খবরের কাগজে ছবি উঠেছে ভারতীর। না জানি কী দারুণ ভিআইপি সে। অবশ্য হাতভাঙা ভিআইপি।

এক্সরে করে হাত প-াস্টার করতে হল। ছোট্ট এক টুকরো হাড় ভেঙেছে এবং সামান্য বেঁকে জুড়েও গিয়েছে। কমজোর হয়ে গেল হাতটা। সবই বাবা অমরনাথের কৃপা — এভাবে দেখলে সহজ হয়ে যায় ব্যাপারটা।

দেবদ্যুতি খবর দিল — জেঠিমার ছবি টেলিগ্রাফ পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়েছে। ওকে ওর মা বলেছিল।

দেখা গেল কথাটা সত্যি। খুঁজে পেতে ৯ই জুলাই তারিখের টেলিগ্রাফের কপি জোগাড় করা হল।

দিনকয়েক পরের কথা।

শেষনাগে জঙ্গীহানা হয়েছে। ২১শে জুলাই, ২০০১। যাত্রী সেজে এসেছিল কয়েকজন আতঙ্কবাদী। তারপর তাদের ঝোলা থেকে বে(ল একে-৪৭ বন্দুক। এলোপাথারি গুলি ছুঁড়তে লাগল যাত্রীশিবিরে। চৌদ্দ জন মারা গিয়েছে। তার মধ্যে চার জন পুলিশ আর দুজন বাঙালি যুবক। হাওড়ার সুরজিৎ এবং অসীম।

আমাদের দলের অমরনাথ যাত্রীরা ফোনে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল — ফাঁকতালে অমরনাথ তো দেখে এসেছি। অজস্রবার ভাগ্যের দোহাই দিতে পারি এজন্যে।

অমরনাথ দর্শন যে কোন ভ্রমণকারীর কাছে স্বপ্ন। দুর্গম অমরনাথ যাত্রার ছবি দেখতে বসলে এখনো যেন বিশ্বাস করতে পারিনা জঙ্গী-কবলিত এই পথে একদা আমরা

বেড়িয়ে পড়েছিলাম। অতিক্রম করেছি ভয়ানক বিপদসঙ্কুল পথ। মনে হচ্ছে আরেকবার ওই পথে যেতে পারলে মন্দ হত না। পথের নেশা এমনই দুর্বার।

সুদূর পথের বাঁশী যদি আবার কখনো বেজে ওঠে তবে হয়তো আরেকবার যাওয়া হবে। অমরনাথ বা অন্য কোথাও।

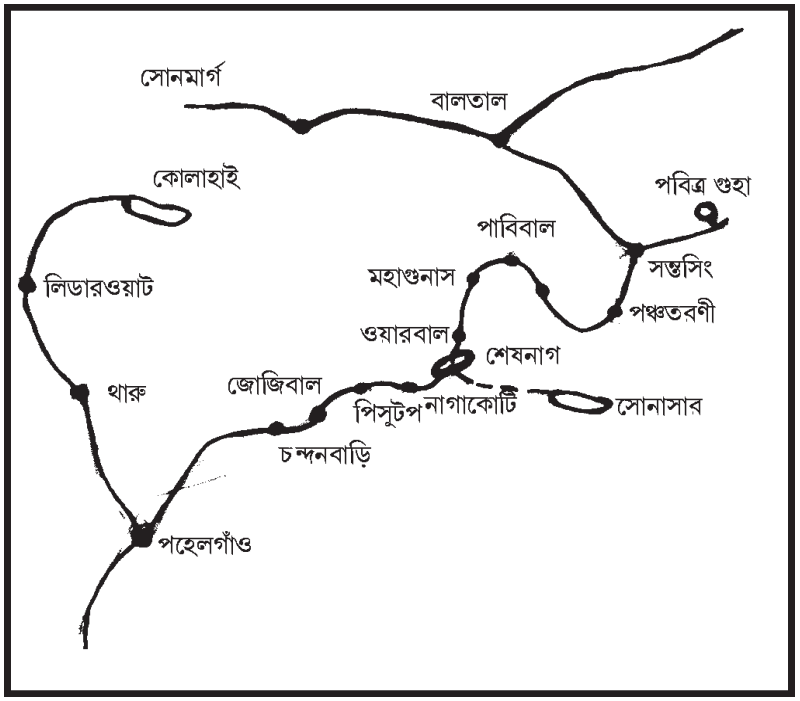

মানচিত্র - অমরনাথ যাত্রাপথ

অমরনাথ যাত্রার পথ

কিছু তথ্য

জম্মু থেকে কাটরা	-	৪৮ কিমি
কাটরা থেকে বৈষে(াদেবী (১৬১৪ মি)	-	১৪ কিমি
জম্মু (৩০৫ মি) থেকে শ্রীনগর (১৭৬৮ মি)	-	২৯৩ কিমি
জম্মু থেকে পহেলগাঁও (২২৮৫ মি)	-	৩১৫ কিমি
পহেলগাঁও থেকে অমরনাথ (৩৯৫২ মি)	-	৪৬ কিমি

	দূরত্ব	উচ্চতা
পহেলগাঁও	০ কিমি	২২৮৫ মি (৭৫০০ ফুট)
চন্দনবাড়ি	১৬ কিমি	২৮৯৫ মি (৯৫০০ ফুট)
পিসুটপ	৩ কিমি	৩৩৭৭ মি (১১০০০ ফুট)
শেষনাগ	৯ কিমি	৩৩৫২ মি (১১১০০ ফুট)
মহাগুনাস পাস	৩.৬ কিমি	৪২৭৬ মি (১৪০০০ ফুট)
পঞ্চতরণী	৮.৪ কিমি	৩৬৫৭ মি (১২০০০ ফুট)
অমরনাথ গুহা	৬ কিমি	৩৯৫২ মি (১৩০০০ ফুট)